বিজ্ঞানকর্মী সংসদ থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বায়োটেকনোলজি
বাংলা বিজ্ঞান সাময়িকী
রক্ত থেকে পুঁজি
বিতর্কমঞ্চ—কুসংস্কার
অপারেশন নরহত্যা
আর কোনো ভূপাল নয়

অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর 1984 দু'টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর 1984

চিঠিপত্র □ বায়োটেকনোলজি : নয়া সুজন্মবাদের শুরু। অভিজিৎ লাহিড়ী □ রক্ত বেচে রুজি রক্ত থেকে পুঁজি। অসীম চট্টোপাধ্যায় □ বাংলা বিজ্ঞান সাময়িকী। রবীন মজুমদার □ কুসংস্কার নিয়ে বিতর্ক : আরো মতামত □ ভূপাল : অপারেশন নরহত্যা। সন্ধানী □ আর কোনো ভূপাল নয় : পরিবেশ আন্দোলন □ বিজ্ঞান আন্দোলনের দুই দরদী সহযাত্রী □ বই পত্রপত্রিকা পরিচিতি □ রিপোর্ট □ প্রচ্ছদ : অতি দাস

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী কোথায় পাবেন

□ কলেজ স্কোয়ারের বইয়ের দোকান কথাশিল্প, বুকমার্ক, পিপ্‌ল্‌স বুক সোসাইটি, বুক্‌স অ্যাণ্ড নিউজ □ শিয়ালদহ নর্থ স্টেশন □ বি. বি. ডি বাগের স্টল ছাড়পত্র, এমা □ শ্যামবাজার ও রাসবিহারী মোড়ের স্টল □ রাজা রামমোহন রায় সরণী, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উল্টোদিকের বইয়ের দোকান 'নবসাহিত্য প্রকাশনী' □ এবং অন্যান্য।

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় □ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার বার টাকা □ প্রতিষ্ঠানিক চাঁদা—চল্লিশ টাকা □ বাংলাদেশের জন্য—ভারতীয় টাকায় কুড়ি টাকা □ বিদেশী গ্রাহকদের চাঁদা—বার্ষিক কুড়ি ডলার □ এজেন্ট কমিশন দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ □ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন □

যোগাযোগ ঠিকানা

প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সেন্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজার স্ট্রিটের সংযোগ-স্থলে বৌবাজার পোস্ট অফিসের বিপরীতে 52/9C বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-700012 ঠিকানায় দোতলায় ডি. এস. এণ্টারপ্রাইজের ঘর □ প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 2/1A আশুতোষ সীল লেন, কলিকাতা-9 □ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা—অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, EC 106 সল্ট লেক, কলকাতা-700064

চিঠিপত্র

পরিবেশ ভাবনার উত্তরে

মে-জুন 1984 সংখ্যায় প্রকাশিত 'পরিবেশ ভাবনা' প্রসংগে কয়েকটি কথা নীচে লিখলাম—

1. কেশোরাম রেয়ন কারখানা থেকে যে গ্যাস পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তার বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা—অর্থাৎ অন্ততঃ এক বৎসর ধরে গ্যাসের গুণগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণী তালিকা তৈরী করা দরকার। প্রয়োজন হলে সরকারী ও বেসরকরী সংস্থাকে এটার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

2. ঐ গ্যাস-উপাদানগুলোর পরিবেশের, বিশেষ করে উদ্ভিদ, প্রাণী ও জনসাধারণের উপর, প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন।

3. পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই ধরনের সমস্যা সমাধানে অনুসৃত পদ্ধতি ও এখানে তার বা তার অনুরূপ কোন পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত সহ কার্যকরী প্রস্তাব গড়া দরকার।

4. এই প্রস্তাব ও পর্যবেক্ষণ পুস্তিকাকারে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচার, তাদের মতামত এবং সমাধানের স্বপক্ষে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা।

5. সরকারী মন্ত্রী বা অফিসার পর্যায়ে এই স্বাক্ষর সম্বলিত প্রস্তাব পাঠানো ও লোকসভার পরবর্তী অধিবেশনে কোন সদস্যকে এ ব্যাপারে আলোচনা শুরুর জন্যে অনুরোধ করা।

রঞ্জন ভদ্র, সল্ট লেক

এত 'বিতর্ক' ভাল লাগে না

আপনাদের জুলাই-সেপ্টেম্বর 1984 যুগ্ম সংখ্যায় এক ফর্মারও বেশী দেখলাম 'বিতর্ক-মঞ্চ'। এত বিতর্ক কাদের জন্য? কার উপকারে লাগে এইসব বিতর্ক? আমরা পাঠকরা চাই নানান স্বাদের রচনা, প্রয়োজনীয় তথ্য, এমনকি বিভিন্ন ধরনের মতামতও পড়তে চাই। কিন্তু দোহাই আপনাদের, শাণিত আক্রমণ আর পাল্টা-আক্রমণে ভর্তি 'পলেমিক্স' পড়তে বাধ্য করবেন না আমাদের। পলেমিক্সটা একটু কমান এবারে।

অতুলকৃষ্ণ রায়, বর্ধমান

ভূপাল ট্র্যাজেডি

ভূপালের ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত, শোকাহত এবং ক্ষুব্ধ। হাজার কয়েক মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে আর একবার আবিষ্কার করলাম কত অসহায় মানুষ আজকের আধুনিক প্রযুক্তির হাতে। বিজ্ঞানের বিষ—মানুষ নয়, কীটের জন্য। তবুও মরল মানুষ।—সামান্য (!) ভুলে। আকস্মিক দুর্ঘটনা নাকি এটি! সরকারী বেসরকারী মহল থেকে এমনটাই বোঝানোর চেষ্টা চলছে। সত্যি-ই কি অপ্রত্যাশিত এমন ঘটনা? মনে তো হয় না তা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অজুহাতে এমন হাজারো বিষের কারখানা চলছে। সেখানে মৃত্যু মানুষের পায়ে পায়ে ছায়ার মত লেগে আছে। অভিজ্ঞ মানুষদের অভিমত—প্রত্যহই এমন ঘটনা যে ঘটেনা সেটাই বিস্ময়ের।

একটি উদাহরণ—ত্রিবেণীর কাছে কেশোরাম রেয়ন কারখানা। সর্বদা সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাইসালফাইড ইত্যাদি গ্যাসে ভারী হয়ে থাকে চারপাশ। কাশি, বুক ব্যথা, গলা-চোখ জ্বালা বমি বমি ভাব মানুষের সর্বক্ষণের সংগী। ঘরে ঘরে অসুস্থতা। এ্যাসিড বাষ্পে জিনিষপত্র টেঁকে না একেবারেই। গাছে পাতা থাকে না। ফল হয় না। জল এ্যাসিড-সম্পৃক্ত। এর মধ্যেই জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। এই হল স্বাভাবিক (!) অবস্থা। দুর্ঘটনা ঘটলে শুনতে হবে—'আকস্মিক' বা 'অপ্রত্যাশিত'। শুধু কেশোরাম নয়। এমন বহু কারখানা ছড়িয়ে আছে আমাদেরই কাছাকাছি।

ওপর তলার বিশেষজ্ঞ নির্ভর সামাজিক কর্মকাণ্ডে মানুষ ঠুঁটোজগন্নাথ। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার স্থান নেই সেখানে। কিভাবে সে বাঁচবে, জীবন ধারণ করবে, বা আদৌ বাঁচবে কিনা, সে জানে না। আধুনিক প্রযুক্তি বা প্রগতির দোহাই আসলে মানুষের অধিকার হননের কৌশল হিসেবে দেখা দিচ্ছে। ভূপালের ঘটনা পুরনো প্রশ্নগুলিকে আর একবার সামনে এনে দিয়েছে। উন্নত দেশের বাতিল রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা স্থানান্তরিত হচ্ছে অনুন্নত দেশে। এজন্য দায়ী কে? কীটনাশক নামের হরেক দ্রব্য পৃথিবীর জল, মাটি, বাতাস কলুষিত করে চলেছে। কার স্বার্থে? বিদেশী কোম্পানী এদেশে কারখানা গড়ে। কারখানার উৎপাদন ফিরে যায় বিদেশে। কেন এই ঘুর-পথ?

চাপা থাকে আর একটি মারাত্মক প্রশ্ন। এই বিশাল ব্যাপক পেস্টিসাইড শিল্প শুধুই কৃষির 'স্বার্থে' তো? নাকি রাসায়নিক যুদ্ধের নানান বিষাক্ত পদার্থ তৈরীর কর্মকাণ্ডকে আড়াল করে রাখার সুপরিকল্পিত 'ফ্রন্ট'? ঠিক যেমন নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরগুলি আড়াল করে রাখে নিউক্লিয়ার বোমার মালমশলা তৈরীর কর্মকাণ্ডকে? ভূপালে যে গ্যাস এতগুলি মানুষ মারলো সেটা শুধুই পেস্টিসাইড তৈরীর জন্যই জমা করে রাখা ছিল ত ট্যাঙ্কে?

এসব প্রশ্ন নয়, ভূপালের হতভাগ্য মানুষগুলো মূলধন হয়ে উঠেছে স্টান্ট আর প্রচারের। সংগে যুক্ত হয়েছে বিলিয়ন ডলার মামলার গোলকধাঁধা। টাকার অংকে শূন্যের হিসেব মেলে না। এত ঢাকঢোলের আড়ালে চাপা পড়ে যাবে না তো ভূপালের ট্রাজেডি? বিশেষ করে তথ্য বিকৃত ও গোপনের যে চেষ্টা চলছে তা মানুষের মৌলিক অধিকার হননেরই সামিল।

বায়োটেকনোলজি : নয়া সুজন্মবাদের শুরু

অভিজিৎ লাহিড়ী

যে প্রযুক্তি যত বেশী উন্নত ও জটিল, যে প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে যত বেশী প্রশিক্ষণ আর দক্ষতা প্রয়োজন, মুষ্টিমেয় সম্ভ্রান্তদের দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভবনা, তার মাধ্যমে বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার আর ক্ষমতার স্তরবিন্যাস আরো স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা, তত বেশী।

রুথ হাবার্ড। সায়েন্স ফর দি পিপ্‌ল (লন্ডন), মে-জুন 1984 সংখ্যা॥

প্রাণের ক্ষুদ্রতম একক হ'ল জীবকোষ। প্রতিটি জীবিত কোষেই নিরন্তর ঘটে চলেছে নানান জটিল জৈব ক্রিয়া-বিক্রিয়া। এরকম অসংখ্য জৈব ক্রিয়ার সমন্বিত রূপই হ'ল একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর জীবন।

জীবনের 'অন্দর মহলের', অর্থাৎ এই জীবকোষের ভিতরকার, ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে কৃত্রিমভাবে প্রভাবিত করে জৈব প্রক্রিয়াগুলিকে ইচ্ছামত বিশেষ বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা—'বায়োটেকনোলজির' মূল উদ্দেশ্য এটাই। অন্তিম লক্ষ্য—শেষ পর্যন্ত ডি-এন-এ এবং প্রোটিন সংশ্লেষের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ। অর্থাৎ জীবনের নিগূঢ়তম প্রক্রিয়াগুলিকে, প্রাণের 'প্রাণভোমরা'-কে, হাতের মুঠোয় আনা।

নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান যেমন পদার্থের গঠনের ক্ষুদ্রতম এককের ভিতরকার জগৎটাকে খুলে দিয়েছিল, বায়োটেকনোলজি তেমনই খুলে ধরেছে প্রাণের অনেক গভীরে লুকানো গুপ্তঘরের দরজা। দুইক্ষেত্রেই প্রকৃতির অজানা রহস্য উন্মোচনের সাথে একইসঙ্গে বেরিয়ে এসেছে ভয়াবহ অভিশাপের বিষবাষ্প।

বায়োটেকনোলজির অসংখ্য অভাবনীয় নতুন সম্ভাবনার ভিতর একটি হল নতুন প্রজননবিজ্ঞান। ভ্রূণ সৃষ্টি থেকে শুরু করে ভ্রূণের বৃদ্ধি এবং শিশুর জন্ম, গোটা প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ ক্রমশ চলে আসছে কৃত্রিম হস্তক্ষেপের আওতার ভিতর। আর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ-অবদমনের অভূতপূর্ব নতুন নতুন সম্ভাবনা। নিজেদের জীবনের উপর, জীবনের একান্ত গূঢ় ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলির উপরও, স্বনিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব মানুষ—উন্নততম সফিস্টিকেটেড বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যাদের আওতার অনেক বাইরে।

সফিস্টিকেটেড বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের ফাঁক আমাদের দেশে 'উন্নত' দেশগুলির তুলনায় অনেক অনেকগুণ বেশী। তাই এখানে প্রায়-আদিম শোষণব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার পদ্ধতির সংমিশ্রণ আরো ভয়াবহ, মর্মান্তিক।

এমনই এক পদ্ধতি হ'ল নয়া সুজন্মবাদ। নতুন প্রজননবিজ্ঞানের কল্যাণে বিগত দিনের সুজন্মবাদী আন্দোলন আজ অনেক সূক্ষ্ম, বিমূর্ত অপ্রতিরোধ্য রূপ ধরে এগিয়ে আসছে মানুষের দিকে।

সুজন্মবাদ বা 'ইউজেনিক্‌স' একটি 'বিজ্ঞান' হিসেবে আবির্ভূত হয় গত শতাব্দীর শেষে। কথাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন ফ্রান্সিস গ্যালটন 'এনকোয়ারী ইন্‌টু হিউম্যান ফ্যাকালটি অ্যান্ড ইট্‌স ডেভেলপমেন্ট' (1883) বইয়ের মাধ্যমে। এই 'বিজ্ঞানের' উদ্দেশ্য হ'ল প্রজনন নিয়ন্ত্রিত করে মানব প্রজাতির উন্নতি সাধন। শুনতে মন্দ নয়। কিন্তু গোড়া থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার খেলায় বড় হাতিয়ার হিসেবে গড়ে উঠলো এই 'বিজ্ঞান'। নানান দেশে 'অবাঞ্ছিত'দের বংশবৃদ্ধি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা শুরু হ'ল—এই অবাঞ্ছিতদের তালিকায় পড়ল অপরাধী, যৌনবিকৃতিগ্রস্ত মানুষ, 'বিকৃতমস্তিষ্ক,' 'দুর্বলমনা লোকেরা, কৃষ্ণাঙ্গরা, এমনকি আরো হাল আমলে ইহুদিরাও! বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন মানবপ্রজাতিকে আরো উন্নত করার দায়িত্ব। শেষ পর্যন্ত ফ্যাসীবাদ প্রকাশ্যেই তার রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে নিল সুজন্মবাদকে। ফ্যাসীস্টদের পরাজয়ে ভাঁটা পড়ল সুজন্মবাদের প্রচারেও। বিজ্ঞান বলে সুজন্মবাদকে সম্মান বা স্বীকৃতি আর দিতে চাইল না মানুষ।

নতুন প্রজননবিজ্ঞান কিন্তু এমন সব বিচিত্র প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ঘটাচ্ছে যাতে আগের চাইতে অনেক কার্যকর ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে সুজন্মবাদের মূল লক্ষ্য—অবাঞ্ছিতদের বংশবৃদ্ধি রোধ আর বিজ্ঞানপ্রযুক্তি যাদের দখলে নেই সেইসব মানুষের জীবনপ্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম। এই নতুন প্রজননবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় সুবিধা—প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মদত আর প্রয়োজন হবে না এর। বস্তুত, মানুষ 'স্বেচ্ছায়'ই নিজেকে তুলে দেবে এই বিজ্ঞানের হাতে—নিজেকে প্রচন্ড সৌভাগ্যবান এবং বিজ্ঞানমনস্ক মনে করবে এই ভেবে যে, সবচাইতে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা সে পাচ্ছে এবং তা গ্রহণ করছে। অহেতুক বিতর্কের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে না অবাঞ্ছিতদের জন্মরোধের সাধু প্রচেষ্টা।

এক নম্বর 'অবাঞ্ছিত'—নারী। তাই 'অ্যামনিওসেন্টেসিস' পরীক্ষার হিড়িক এদেশেও। পরীক্ষার খরচ খুব কম নয়। মধ্যবিত্তরাও, এমনকি অনেক কম আয়ের লোকেরাও, সৎ-অসৎ নানা ধান্ধায় অনেক সময়,

আর অনেক পরিশ্রম ব্যয় করে—সম্ভবত জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন করেও—উপার্জনের টাকায় জানতে চাইছে গর্ভস্থ শিশু ছেলে না মেয়ে। উদ্দেশ্য সেই একই—অবাঞ্ছিতদের পৃথিবীতে আসতে না দেওয়া। একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, পরীক্ষা করিয়ে গর্ভস্থ শিশু মেয়ে জেনে ভ্রূণহত্যা ঘটানো হয়েছে, এরকম ঘটনার সংখ্যা 1978 থেকে 1982'র ভিতরই এদেশে ছিল অন্তত 78000—'82'র পর নিশ্চয়ই আধুনিকতার রাস্তা ধরে আরো অনেক জোর কদমে হাঁটছি আমরা, এই দেশের মানুষরা।

অ্যামনিওসেন্টেসিসেরও প্রয়োজন হয় না সর্বদা। 'বিশেষজ্ঞ' ডাক্তাররা রয়েছেন—মোটা অঙ্কের ফী নেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কত চিন্তিত তাঁরা। তাই কোনো মায়ের প্রথম একটি বা দু'টি বাচ্চার কোনো অসুখ বা বিকৃতি থাকলে ভয় দেখিয়ে বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশনের 'পরামর্শ' দেন অথবা শিশু গর্ভে এসে গেলে 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ' থেকে তাকে নষ্ট করতে বলেন। অবশ্যই, যে সব পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ তাদেরকেই এই ধরনের দরদী পরামর্শ দেওয়া হয় বেশী করে।

সমস্যাটা অবশ্য সত্যিই জটিল। বিকৃত, বিকলাঙ্গ অথবা জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন শিশু জন্মাক এটা কখনই চাইবে না মা-বাবা—সম্ভব হলে সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থ দিয়েও ঠেকাতে চাইবে সে সম্ভাবনা। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, সিদ্ধান্ত নেওয়ার কার্যকর অধিকার মা-বাবার, বিশেষত মায়ের হাতে থাকছে কি না। 'কার্যকর' কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপাতদৃষ্টিতে এ অধিকার সব মা-বাবারই থাকে সর্বদা। কিন্তু তাদের নিজেদের বোঝবার মত করে বিপদের সঠিক প্রকৃতি জানা দরকার, ঝুঁকিটা ঠিক কি পরিমাণের সেটা জানা দরকার, বিপদ ও ঝুঁকি কাটিয়ে ওঠার কতটা কি ব্যবস্থা আছে জানা দরকার, সেই ব্যবস্থা সহজলভ্য হওয়া দরকার, আর সবচেয়ে বড় কথা, বিকল্প পরামর্শ পাওয়া দরকার—যাতে একাধিক বিকল্পের ভিতর থেকে বেছে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। বলা বাহুল্য—কোনোটাই পাবেনা এদেশের 'বিজ্ঞানমনস্ক' সাধারণ মানুষ। প্রথম কারণ, একাধিক বিশেষজ্ঞ দেখানোর মত টাকা কোথায়? আর দ্বিতীয়—বিশেষজ্ঞের সময় কোথায় অত ব্যাখ্যা করে বোঝানোর? 'ডাউন্স সিন্ড্রোম', 'সেক্স লিঙ্কড জেনেটিক অ্যাবনরম্যালিটি'—এ ধরনের কিছু রক্ত-জল-করা কথার ভিত্তিতেই যা-হোক কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হয়। আর অত বুঝতেই বা চাইছে কে? খুব সাদামাটা ব্যাপারে মাথা ঘামায় মানুষ তার বাইরে যা বোঝার তার জন্য ত' বিলেত-ফেরৎ ডাক্তারবাবুই আছেন।

শেষ পর্যন্ত যদি বা কিছু বোঝা গেল, তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবে কে? মা? গর্ভস্থ শিশু মায়েরই দেহের একটা অংশ—শরীর, মন, আবেগ, সব দিক দিয়েই শিশুর সঙ্গে মায়ের যোগাযোগ সবচাইতে নিবিড়, এ কথা না হয় মানা গেল। কিন্তু তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পর্কটা কোথায়? পন্ডিতমুখ্যু কিছু হুজুগে ফেমিনিস্টই শুধু বলে এসব কথা। মা জানেটা কি, যে সিদ্ধান্ত নেবে? ('আর এইচ নেগেটিভ? সেটা আবার কি গো?'—'ও এক সাংঘাতিক অসুখ, তুমি বুঝবে না'।)

তাই, শেষ পর্যন্ত সেই 'টেকনোলজিকাল গ্যাপ'ই সব। এই গ্যাপের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠছে এমন এক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, এমন এক গভীর মানসিক কন্ডিশনিং, যাতে একই সঙ্গে মানুষ নির্বিবাদে হারিয়ে বসছে একান্ত নিজস্ব জীবনপ্রক্রিয়ার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ, আর কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই অবলীলায় এলিমিনেটেড হয়ে যাচ্ছে 'অবাঞ্ছিত' প্রজন্ম। নোংরা রাজনীতির আর দরকারই হচ্ছে না সুজন্মবাদী আন্দোলনকে জোরদার করতে।

আজকে অবাঞ্ছিতদের তালিকায় আছে 'মোঙ্গোলিজ্‌ম'। আগামীকাল হয়ত তালিকায় যোগ হবে সেইসব বাবা-মায়ের অনাগত সন্তান যাদের 'আই কিউ' একশ'র কম। না, আই কিউ-এর দরকার নেই এখনই, কারণ ও নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে—তার চেয়ে আগামী প্রজন্মের প্রতি গভীর মমত্ববোধ অনেক বেশী সুবিধাজনক। 'ভ্রূণের অধিকার' বা 'ফিটাল রাইট্‌স' নিয়ে অনেক কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। যে শিশু জন্মাতে চলেছে তার অধিকার আছে সুস্থ পরিবেশে সুস্থভাবে বড় হওয়ার। তাই বাবা-মা যদি হতদরিদ্র হয়, যদি 'অস্বাস্থ্যকর' হয় পারিবারিক পরিবেশ, তবে সেই শিশুরই স্বার্থে বাবা-মায়ের বাধ্য থাকা উচিৎ বিশেষজ্ঞের মতে ভ্রূণহত্যা ঘটাতে, বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশনে সামিল হতে। গর্ভপাতের বদলে পরিবেশটাকে আরো উন্নত, আরো স্বাস্থ্যকর করে তোলার চেষ্টা—এ ব্যাপারটা ত আর বিশেষজ্ঞর আওতায় পড়ে না। আর বিশেষজ্ঞ যদি মনে করে যে শিশু জন্মাবে কোনো 'অ্যাবনরমালিটি' নিয়ে তবে সুন্দর নতুন দুনিয়ার ('ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড') শাসকরা নিশ্চই বাবা-মাকে বাধ্য করতে পারে গর্ভপাতে রাজী হতে। বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী আর কমপিউটার তাই এত প্রিয় সুন্দর নতুন দুনিয়ার শাসকদের। বিশ, পঁচিশ বা ছাব্বিশ দফার কর্মসূচীতে সহায়ক হয় দুইই।

'অবজেক্টিভ ট্রুথ' ই নাকি বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। 'সাবজেক্টিভ ফিলিং'-কে ভয়ানক অপছন্দ করে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। সাব্‌জেকটিভ অনুভূতির উপর জোর দেওয়াটা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ—বিরাট কুসংস্কার একটা। প্রজননের গোটা প্রক্রিয়া থেকেই তাই বাদ দিতে হবে এই সাবজেকটিভ অনুভূতির দিকটাকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মটা কেমন হবে—কত পার্সেন্ট ছেলে, কত পার্সেন্ট মেয়ে দরকার, কোন ইনকাম গ্রুপের কটা করে সন্তান থাকবে, কোন মায়ের অধিকার থাকবে সন্তানধারণের, কারা সন্তানধারণ করবে গর্ভে আর কাদের সন্তান হবে টেস্ট টিউবে বা অন্য মহিলার জরায়ুতে, এ সবই নির্দ্ধারণ করে দেবে—না, না, ভয়ের কিছু নেই, রাজনৈতিক শাসকরা নয়—বিজ্ঞান। শাসকরা থাকবে আড়ালে।

ফ্যাসিজ্‌মের কোনো গন্ধ আর থাকবে না এই নয়া সুজন্মবাদে—ইতিমধ্যেই যার সূত্রপাত ঘটিয়েছে বায়োটেকনোলজি। হ্যাঁ, এদেশেও।

সূত্র ঃ 1. সোস্যালিস্ট হেল্‌থ রিভিউ (বম্বে), সেপ্টেম্বর 1984 সংখ্যা, পৃঃ 69-71;
2. সায়েন্স ফর দি পিপ্‌ল (ম্যাসাচুসেট্‌স), মে-জুন 1983 সংখ্যা, পৃঃ 18-23, পৃঃ 24-27;
3. —ঐ— মার্চ-এপ্রিল 1984 সংখ্যা, পৃঃ 7-9.

বায়োটেকের টুকিটাকি

ভ্রূণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা—নীতিগত বিতর্ক

অস্ট্রেলিয়ার অগ্রণী ভ্রূণ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ রবিন রোল্যান্ড গত মে মাসে পদত্যাগ করেছেন ভ্রূণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নীতিগত প্রশ্নগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ার প্রতিবাদে। শ্রীমতী রোল্যান্ড নিম্ন তাপমাত্রায় ভ্রূণ সংরক্ষণের গবেষণায় প্রথম সারির গবেষক। রোল্যান্ডের অভিযোগ, বিশেষজ্ঞরা নির্বিচারে মহিলাদের দেহকে 'জীবন্ত ল্যাবরেটরী' হিসেবে ব্যবহার করে যাচ্ছেন। তাঁর মতে এ ধরনের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামাজিক ফলাফল কি হতে পারে না পারে সে সম্পর্কে আরো সময় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। অথচ এই ভাবনাচিন্তা ছাড়াই দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞানপ্রযুক্তির গবেষণা ও নানান উদ্ভাবন। -রোল্যান্ড নিজে এর ফলে যে মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন তার দরুনই তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

রোল্যান্ড প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরই সহকর্মী ডঃ কার্ল উড্-এর একটি বক্তব্যের বিরুদ্ধেও। উড্-এর মতে, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে যে সব শিশু জন্মেছে তাদের 'আই-কিউ' সাধারণের চাইতে বেশী। রোল্যান্ড-এর বক্তব্য, এই ধরনের কথাবার্তা আসলে পছন্দমত 'বাছাই করা' শিশু তৈরীর মানসিকতার পূর্বাভাস।

সূত্র ঃ নিউ সায়েন্টিস্ট (লন্ডন) 31 মে 1984 সংখ্যা, পৃঃ 5.

অ্যামনিওসেন্টেসিস

গর্ভস্থ শিশুকে আচ্ছাদন করে থাকে যে তরল, চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় তার নাম 'অ্যামনিওটিক ফ্লুইড'। এই তরলের ভিতর নিমজ্জিত থাকে ভ্রূণশিশু, একটি পাতলা পর্দা বা 'মেমব্রেন'-এ আবৃত হয়ে। এই পর্দা ফুটো করে 15-20 সি. সি. তরল টেনে নেওয়া হয় একটি সূচের সাহায্যে। অ্যামনিওটিক তরল থেকে ভ্রূণের কোষপদার্থ আলাদা করে নিয়ে পরীক্ষা করা হয় কোষের ক্রোমোজম্।

পরীক্ষাটি ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য ভ্রূণের বয়স হওয়া দরকার অন্তত 16 সপ্তাহ। এর মাধ্যমে সনাক্ত করা যায় ভ্রূণের ক্রোমোজমের কিছু অস্বাভাবিকতা, জানা যায় ভ্রূণ ছেলে না মেয়ে তাও। লিংগ সনাক্তকরণের প্রয়োজন হয় হিমোফিলিয়া এবং অন্যান্য কিছু লিংগ-সংশ্লিষ্ট অস্বাভাবিকতা নির্ধারণের জন্য।

তবে পরীক্ষার ফলাফল 100% নির্ভরযোগ্য নয়। ঝুঁকিও আছে। বোম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে দেখা গেছে, প্রায় 1% সংখ্যক ভ্রূণের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই পরীক্ষার দরুন। তাছাড়া গর্ভপাতের, অপরিণত শিশু প্রসবের, গর্ভস্থ শিশুর দেহে নানা ধরনের ক্ষত সৃষ্টির, সম্ভাবনা আছে এই পরীক্ষায়। পরীক্ষাটি করতে সময় লাগে অনেক সময় এক সপ্তাহ মত, রিপোর্ট হাতে পেয়ে গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নিতে ভ্রূণের বয়স হয়ে যায় 18 সপ্তাহ। গর্ভপাত ঘটানো তখন মায়ের পক্ষেও বেশ ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে অ্যামনিওসেন্টেসিসের সাহায্য নিচ্ছে ক্রমশ বেশী সংখ্যক মানুষ। দূর দূর থেকেও মানুষ আসে এই পরীক্ষা করাতে। খরচ আশী টাকা থেকে পাঁচশ টাকার ভিতর। ফলে ক্রমশ বাড়ছে এর চাহিদা।

1901 সালে এদেশে মহিলার সংখ্যা ছিল প্রতি হাজার পুরুষে 972 ; আর 1981-তে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজার পুরুষে 935-এ। অ্যামনিওসেন্টেসিস নিশ্চয়ই আরো ত্বরান্বিত করবে পুরুষের আপেক্ষিক সংখ্যাবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াটিকে।

[সূত্র ঃ সোস্যালিস্ট হেল্থ রিভিউ, সেপ্টেম্বর 1984 সংখ্যা]

কৃত্রিম অণুজীব—রিফকিন বিতর্ক—আন্ত্রিক রোগ

বায়োটেকনোলজির নানান চমকপ্রদ অভাবনীয় আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের অন্তরালে সৃষ্টি হচ্ছে যে অসংখ্য সামাজিক, মানবিক, পরিবেশগত সমস্যা—তার হদিশ কি রাখছি আমরা ? এই বায়োটেকনোলজিরই সূত্র ধরে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা দেবে এমন সব নতুন নতুন সমস্যা যার কোনো ধারণাই এখন আমাদের নেই। তাই চমকপ্রদ আবিষ্কারগুলি দেখে আনন্দে ডগমড হয়ে শুধু বাহবা দেওয়াই নয়, গভীর চিন্তা ভাবনারও দরকার আছে।

অথচ প্রযুক্তির দৌড়, মুনাফার হাতছানি, আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা—এ সবের চাপে এত চিন্তা ভাবনা করতে রাজী নয় ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলি, আর সরকারী বিশেষজ্ঞ তথা আমলারা।

বায়োটেকনোলজির একটি বহু-বিতর্কিত প্রশ্ন হল কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত বিভিন্ন ধরনের অণুজীব (মাইক্রো-অরগ্যানিজম্)-কে পরিবেশে ছেড়ে দিয়ে অবাধে বংশবৃদ্ধি করতে দেওয়া উচিৎ কি না। কারণ পরিবেশে এগুলিকে ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি অনেক। সম্প্রতি আমেরিকায় সিটাস করপোরেশন (উইসকনসিন) আর অ্যাডভান্সড জেনেটিক

সায়েন্সেস (AGS, কনেটিকাট) নামে দুটি কোম্পানি কিন্তু ছাড়পত্র পেয়েছে তাদের উদ্ভাবিত কিছু অণুজীবকে পরিবেশে ছেড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। ছাড়পত্র দিয়েছে সরকারী রিকমবিন্যান্ট ডি-এন-এ অ্যাডভাইসরি কমিটি (RAC)। অথচ এই RAC-ই তার আগে একটি মামলার রায়ে আদালতের কঠোর সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিল পরিবেশে অণুজীব ছাড়তে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে।

মামলাটি দায়ের করেছিলেন পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী জেরেমি রিফকিন। সিটাস এবং AGS কে RAC যে অনুমতি দিয়েছে তারও সমালোচনা করেছেন তিনি। এই রিফকিনই তার আগে সংবাদের শিরোনামে এসেছিলেন আর একটি বিতর্কের সূত্র ধরে।

আন্ত্রিক ব্যাধির মারাত্মক জীবাণু শিগেলার দেহের যে অংশ বিষ-পদার্থ ('টক্সিন') সংশ্লেষিত করে সেটির হুবহু অনুলিপি তৈরী বা ক্লোনিং-এর প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিলেন রিফকিন। তাঁর অন্যতম বক্তব্য, যে সংস্থাটি এই প্রকল্পের আবেদন করেছে সেটি সামরিক বিভাগের অধীন, এবং এই প্রকল্পের গবেষণার ফল সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেও প্রকল্পটিকে অনুমোদন করে দিয়েছে RAC—তাদের বক্তব্য, শিগেলা এবং কলেরার টিকা তৈরীতে সহায়ক হবে এই গবেষণা।

পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রতিক শিগেলাবাহিত আন্ত্রিক মহামারী প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানকর্মী মহল থেকে সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়েছিল—এর সঙ্গে জীবাণুযুদ্ধের গবেষণা সংক্রান্ত কোনোরকম প্রচেষ্টার সম্পর্ক আছে কিনা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত NICED (ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অভ কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেস) নামক সংস্থাটির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল অনেক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, এই NICED-এও কিন্তু উপরোক্ত ক্লোনিং সংক্রান্ত কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। এবং খোদ ভারত সরকারের সংস্থা ICMR-ই শিগেলা আর কলেরার টিকা তৈরীর প্রকল্পের উমেদারী করছে।

রক্ত বেচে রুজি
রক্ত থেকে পুঁজি

অসীম চট্টোপাধ্যায়

শহর কলকাতা বা হাওড়া অথবা আশপাশের জেলায় এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, যারা নিয়মিত রক্ত বেচে শরীরের। বেচলে কিছু টাকা মেলে, দু' পাঁচদিনের ভাত-রুটি জুটে যায়। মোটেই কম নয় এরকম পেশাদার রক্তদাতা। শুধু ক'টা টাকার জন্য ভ্যাসেক্টমি করিয়েছে—এমন-লোকও চারপাশে যথেষ্ট।

এ আলোচনাটা ঠিক কলকাতা বা আশপাশ কেন্দ্রিক নয়। বোম্বাই শহরে এই রক্ত-ব্যবসার সমীক্ষা করেছিলো Center for Education and Documentation (CED)। সেই সমীক্ষার কথাই লিখছি ছোট্ট করে। একই সঙ্গে, একই বিষয়ের ওপর একটা জার্মান সমীক্ষার বিবরণও রাখা যাক—যেখানে আলোচনাটা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে।

রক্ত সংগ্রহ বোম্বাইতে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের পরবর্তীকালে বোতল পিছু 12 টাকা করে পেতো। দাতারা একটা করে কার্ড পেতো, যা দেখিয়ে তাদের প্রয়োজনের সময় তারা রক্ত পেতে পারতো। এই কার্ডপ্রথা চালু এখনও। আর—কার্ডগুলো বেশ দামে হাত-ফেরতাইও হয়ে থাকে। আজও, 150 টাকায় কার্ড বিক্রীর ঘটনা অজস্র ঘটে।

বোম্বাই শহরে এই মুহূর্তে বেশ কিছু বাণিজ্যিক ব্লাড্ ব্যাঙ্ক আছে। গোটা শহরের শতকরা 20 ভাগ রক্তের যোগান দেয় এই সব ব্লাড্ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার রক্তদাতারা। অধিকতর সাধারণ পজিটিভ (Rh+) গ্রুপের রক্তের জন্য এই ব্যাঙ্কগুলি দাতাদের দেয় 30 টাকা আর নেগেটিভ্ গ্রুপের জন্য 60 টাকা। এই সব পেশাদার রক্ত-দাতাদের আবার নিয়ে আসে কিছু এজেন্ট, যারা এই টাকা থেকে নিজেদের কমিশন রাখে।

বলার অপেক্ষা রাখে না—দাতারা গরীব। না হলে রক্ত বেচে রুটির রাস্তা খুঁজবে কেন? হিসেব বলছে, বেশির ভাগ রক্তদাতাই বেকার, স্বাস্থ্য দুর্বল আর বয়স 22 থেকে 40-এর মধ্যে।

সংগৃহীত রক্ত বিক্রী করা হয় প্রাইভেট্ হাসপাতালগুলির অর্থবান রোগীদের কাছে—এক বোতল 150 টাকায় কমপক্ষে। দেখা গেছে, এইসব বাণিজ্যিক ব্লাড্ ব্যাঙ্কগুলি ভালোভাবে রক্তদাতার রক্ত পরীক্ষা করেও দেখে না। এমন অনেক পেশাদার রক্তদাতার রক্ত সংগৃহীত হয়, যাদের জণ্ডিস্, ম্যালেরিয়া এমনকি যৌনরোগ পর্যন্ত থাকে। মুনাফার আকর্ষণে সঞ্চালিত হয় রোগের বীজ।

অনেক ব্লাড্ ব্যাঙ্কে এখন ব্যবহার করা হয়ে থাকে প্লাজ্মা ফোরেসিস্ (Plasmaphoresis) পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে গৃহীত রক্তকে ভাগ করে ফেলা হয় প্লাজমা এবং রক্তকোষে। যার প্রয়োজন, তাকে প্লাজ্মাটা দিয়ে, দাতার শরীরে লোহিত কণিকাগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয় ইন্জেকশনের মাধ্যমে। শুধু লোহিত কণিকা দরকার এমন রোগীও আছে। পদ্ধতিটা আপাতভাবে সুবিধাজনক কিন্তু—রক্ত বেচে রুজি সন্ধানী মানুষগুলির কাছে সমস্যাটা সমস্যাই থেকে যায়। কারণ, একান্ত প্রয়োজনীয় প্লাজ্মা প্রোটিন্ বেরিয়ে যায় প্রতিবার। প্রয়োজন হয় মাছ-মাংস-ডিম-দুধ জাতীয় খাদ্য। লিখে না দিলেও বুঝে নেওয়া যায়—এগুলি খায় না, খেতে পারে না পেশাদার রক্তদাতারা।

বোম্বাইয়ের দশমাসব্যাপী সুতোকল ধর্মঘটের সময়কালের একটা পর্যবেক্ষণ জানাচ্ছে—ঐ ধর্মঘটের সময় থেকে পেশাদার রক্তদাতার সংখ্যা বেড়ে গেছে শতকরা 10 থেকে 15 ভাগ। কারণটা সহজবোধ্য।

আর একটা তথ্যও বেশ মজার। ফেডারেশন অফ বম্বে ব্লাড্ ব্যাঙ্কস্ (FBBB)-এর অধীনস্থ 24-টি ব্লাড্ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কারখানা থেকে রক্ত সংগ্রহের কাজ করে থাকে। কারখানাগুলিতে, লক্ষ্য করা যায়—রক্তদান করতে এগিয়ে আসে শ্রমিকরাই, মালিকরা নয়!

1982 সালের প্রথম দশ মাসে, মাদ্রাজের একটি প্রধান সরকারী হাসপাতালে শরীরে রক্ত দেওয়ার পর মারা যায় আট জন। বিভিন্ন হাসপাতালে, রক্ত দেওয়ার পর জন্ডিস ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নজরে আসে। আর—গোটা মাদ্রাজের সংগৃহীত রক্তের শতকরা 60 ভাগই বাজারে কেনা হয়। কারা বিক্রী করে? প্রশ্নটা অর্থহীন। উত্তরটা স্বতঃসিদ্ধ।

এবারে আসি জার্মান সমীক্ষাটার কথায়। এটি প্রকাশ করেছে BUKO (Bundes kongress entwicklungs politisher Aktions-gruppen) প্রকাশন। বলে রাখা ভালো, বোম্বাইয়ের CED সংস্থাই এ সমীক্ষাটিকেও আমাদের হাতের কাছে এনেছে।

মোটামুটিভাবে, পঞ্চাশের দশক থেকেই রক্ত একটা পণ্য হয়ে উঠেছে—বিকি-কিনির হাটে যে পণ্য নেহাত ফ্যাল্না নয়। আমেরিকাতে জন্ম নেয় বেশ কিছু ব্যক্তিগত ব্লাড্ ব্যাঙ্ক, যারা হাসপাতালে আর রোগীদের কাছে রক্ত বেচতে শুরু করে।

ষাটের দশক থেকে চালু হল প্লাজমাফোরেসিস্ পদ্ধতির প্রয়োগ। আরো ফুলে-ফেঁপে ওঠে রক্ত ব্যবসা। কারণ—এ পদ্ধতিতে দাতার হিমোগ্লোবিন্ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ফলে, সে আরও ঘন ঘন দিতে পারে তার রক্ত।

তৃতীয় বিশ্বে প্রথম প্লাজমাফোরেসিস্ কেন্দ্র চালু হয় লাতিন আমেরিকায়। সেখান থেকে একটার পর একটা পদক্ষেপ—এশিয়া, আফ্রিকা। ওদিকে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা। একই রক্তমাখা হাত দুনিয়ার সর্বত্র।

আমেরিকায়, শরীরের প্লাজমা বেচে লিটার পিছু বিক্রেতা যতো টাকা পায়, তৃতীয় বিশ্বের দেশের বিক্রেতাদের থেকে তা প্রায় 10 গুণ বেশি। ব্যবসাটা আমেরিকাতেও জমজমাট। পেশাদার রক্ত (বা প্লাজমা) বিক্রেতা এখন সেখানে প্রচুর।

জার্মান সমীক্ষাটি বলছে—ভারতবর্ষে প্রায় 40 হাজার মানুষ বেঁচে আছে রক্ত বিক্রী করে। আর ব্যবসায়ীদের মুনাফা বোঝাতে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে বলিভিয়ার। বলিভিয়াতে আধ লিটার প্লাজ্মা বেচে মানুষ যতো টাকা পায় (10 DM), বিশ্ব বাজারে তার থেকে 12 গুণ বেশি দামে (120 DM) সেই প্লাজ্মা বিক্রী হয়!

এই মুহূর্তে লাতিন আমেরিকায় প্লাজ্মা সংগ্রহের কেন্দ্র রয়েছে মেক্সিকো, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া আর ব্রাজিলে। পেরুর সংবাদপত্র 'এক্সপ্রেসো' (Expresso)-র খবর অনুযায়ী—1973 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্লাজ্মা কিনেছিলো 2 মিলিয়ন্ ডলার। ঐ একই খবর থেকে জানা যায়—পশ্চিম জার্মানীর হয়েশ্ট্ (Hoechst) আর বায়োরেস্ট (Biorest) কোম্পানী এই প্লাজ্মা ব্যবসায়ে রয়েছে। এটুকুই শুধু নয়, ব্রাজিলে এ ব্যবসাটায় একচেটিয়া আধিপত্য হয়েশ্ট্-এরই।

আমেরিকাতে 1970 সালে রিচার্ড এম্. টিটমাস্ (Richard M. Titmuss)-এর গবেষণা 'দ্য গিফ্ট্ রিলেশন্শিপ' (The Gift Relationship) দেখিয়েছিলো—যেহেতু টাকা পাওয়া যায়, তাই রক্তদাতাদের অধিকাংশই সমাজের সুবিধাহীন মানুষেরা। এদের মধ্যে আছে বেকাররা, কালো মানুষরা, জেলখানার বন্দীরা। এরা অপুষ্টিতে ভোগে, স্বাস্থ্য দুর্বল। ফলত, ক্ষতি হয় রক্তদাতা ও গ্রহীতা—উভয়েরই। মিলিয়ে দেখলে—তৃতীয় বিশ্ব আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, চিত্রটা পুরোপুরি না হলেও, অনেকটাই এক। হয়তো, রক্তের রঙ সর্বত্র লাল বলেই!

'ওয়ার্ল্ড হেল্থ্ অর্গ্যানাইজেশন্' (WHO) সমালোচনা করেছে এই রক্ত ব্যবসার। সংস্থার 1975 সালের 1 মে'র প্রতিবেদনে বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়। যেমন—অপুষ্টিতে আক্রান্ত দাতার পক্ষে প্লাজ্মাফোরেসিস্ একটা শারীরিক ক্ষতি; এ পদ্ধতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে অ্যালকোহলিক্ ও ড্রাগে আসক্তদের, কতকগুলি ক্ষেত্রে প্লাজ্মা গ্রহীতার হেপাটাইটিস্ হওয়ার প্রচন্ড সম্ভাবনা থাকে।

বেশ কিছু মানুষের রুজি আর কয়েকজনের পুঁজি যুগিয়ে চলেছে রক্ত। যুগিয়ে চলেছে দুনিয়ার দেশে দেশে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রপত্রিকার সংখ্যা বেশ বেড়েছে। দৈনিক পত্রিকাতেও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রায়ই প্রকাশিত হয়। এই জোয়ারের সময় এটা খুবই সম্ভব যে একই সঙ্গে ভালো এবং মন্দ দুই-ই বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানের নামে অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান একই সাথে চালান হচ্ছে। কথা হল বাছাই করা হবে কি ভাবে?

বাংলা বিজ্ঞান সাময়িকী

রবীন মজুমদার

বছরখানেক আগে একটা কথা শুনেছিলাম—বম্বেতে নাকি একটি নতুন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যাতে সপ্তাহে দুদিন বিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষ ক্রোড়পত্র থাকবে। খবরটি আমাকে প্রচণ্ড উৎসাহিত করেছিল। মহারাষ্ট্র-বম্বের 'লোক বিজ্ঞান সংগঠন' বিগত কয়েকবছর ধরে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আন্দালন করছে, অঞ্চল-বিশেষে তারা বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে। দৈনিক কাগজের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের পরিকল্পনার পেছনে ছিল তারাই। ইতিমধ্যে সেটি বাস্তবায়িতও হয়েছে, তবে ভাষা ইংরাজী।

ইতিমধ্যে কলকাতায় 'আজকাল' অনুরূপ একটি উদ্যোগ নিয়ে বসল। হোক না সপ্তাহে মাত্র একদিন, পুরো একটা পৃষ্ঠা বিজ্ঞানের জন্য বরাদ্দ করার পদক্ষেপ নিলেন তাঁরা। এযাবৎ যতটুকু দেখা যাচ্ছে সাড়াও মিলছে বেশ। দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায়, একটি আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান এভাবে নিয়মিত জায়গা দখল করার ঘটনা সম্ভবত ভারতে এই প্রথম।

তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কি ইদানীং বিজ্ঞান বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে? বিজ্ঞানভিত্তিক খবর ও রচনা কি বিশেষ জনসমাদর লাভ করছে? ব্যক্তিগত-ভাবে আমার মনে হয় বিগত পাঁচ-ছয় বছরে এরকম অনুকূল একটি পটভূমি সত্যিই কিছুটা গড়ে উঠেছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনা ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের নতুন এক জোয়ার এসেছে। সাহিত্য সংস্কৃতির প্রায় সব সাময়িকীতেই যেমন বিজ্ঞানের জন্য স্থান বরাদ্দ হচ্ছে, তেমনি শুধুমাত্র বিজ্ঞানের জন্যই পত্রপত্রিকার সংখ্যাও বেশ বেড়েছে। হালফিলের বাংলা বিজ্ঞান সাময়িকী প্রসঙ্গে আলোচনা তাই স্বাভাবিক ও প্রয়োজন।

একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার: বর্তমান প্রবন্ধে বাংলায় প্রকাশিত (প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ থেকে) সমস্ত বিজ্ঞান পত্রপত্রিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি দেবার কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না; যদিও সে কাজটা জরুরী, এবং আশার কথা, কেউ কেউ একাজে হাতও দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মূলত দুটি—(এক) সাম্প্রতিককালে বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনায় যে একটা তেজীভাব দেখা দিয়েছে, যেকথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তা বোঝাবার চেষ্টা করা এবং (দুই) সুযোগ বুঝে বিজ্ঞানের নামে অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান দিয়ে বাজার মাৎ করার চেষ্টাও যে চলছে বা ক্রমশ বেশী করে চলতে পারে, সেই আলোচনার সূত্রপাত করা।

মূলত দুটি সূত্রে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের "বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান" শীর্ষক একটি বই (1960) এবং কলকাতার সোসিও ইকনমিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-কৃত একটি সমীক্ষার রিপোর্ট। শেষোক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে 1818 খ্রীষ্টাব্দকে বাংলা বিজ্ঞান সাময়িকীর সূচনাবর্ষ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। 1868 থেকে 1900 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 57টি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় শুধু বিজ্ঞান বিষয়ে, আর 1820 থেকে 1868র মধ্যে হয় 7টি। ঐসব বিজ্ঞান সাময়িকীর আয়ুষ্কাল বিষয়ে যদিও রিপোর্টে বিশেষ উল্লেখ নেই, তবুও এটা বোঝা যায় যে একনাগাড়ে তিন বছরের বেশী সময় ধরে জীবিত থাকা সাময়িকীর সংখ্যা নিতান্তই কম। দুঃখের কথা, 1947-এর পরবর্তীকাল এঁরা সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেননি, যদিও সমীক্ষাটি করা হয়েছে 1977-78-এ। বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর প্রচেষ্টায় ও প্রেরণায় 1948 সালে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হলেও, পরিষদও কিন্তু এই কর্তব্যপালনে এগিয়ে আসেননি। কাজেই অনতি-অতীতের এই সময়টুকু আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নেই। সাধারণভাবে শুধু উল্লেখ্য যে 1950-70-এর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা বিজ্ঞান পত্রপত্রিকা দেখা দিয়েছিল, তবে তার প্রায় সবগুলিই এখন উঠে গেছে।

বর্তমানে চালু এধরনের পত্রপত্রিকার সঠিক সংখ্যা যদিও অজানা, তবু নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় এমন পত্রপত্রিকার সংখ্যা অন্তত ডজনখানেক, যার মধ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'ই বয়োজ্যেষ্ঠ। যতদূর জানা আছে, পত্রিকাগুলির নাম, (প্রকাশস্থান ও সূচনাবর্ষ) নীচে দেওয়া গেল: "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" (কলকাতা, 1948); "মানবমন" (কলকাতা, 1962) "আনৃণ্য" (কলকাতা, 1969); "বিজ্ঞানী" (কলকাতা, 1971); "বিজ্ঞান বিচিত্রা" (সাম্প্রতিক পরিবর্তিত নাম "জ্ঞান-বিচিত্রা") (আগরতলা, ত্রিপুরা, 1976); "বিজ্ঞান-মনীষা" (মেদিনীপুর, 1977); "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী" (কলকাতা, 1977); "উৎসমানুষ" (কলকাতা, 1980); "বিজ্ঞান-প্রদীপ" (কলকাতা, 1980);

"মন্থন" (কলকাতা, 1980) ; "বিজ্ঞান-সমাচার" (পরিবর্তিত নাম "বিজ্ঞান ক্লাব") (গোবরডাঙ্গা, 1981) ; "বিজ্ঞান মেলা" (কলকাতা, 1981) ; "অঙ্কুরে শুরু" (কলকাতা, 1981) "অন্বেষা" (কলকাতা, 1982) ; "লোকবিজ্ঞান"(কাশীনগর, 1982) ইত্যাদি ।

এছাড়াও অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় বেশ কিছু বিজ্ঞান সাময়িকী । উল্লেখযোগ্য দু একটি নমুনা—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত "বিজ্ঞান", চুঁচুড়া বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশিত "দিশারী", ও কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার প্রকাশিত "অন্বেষক", ইত্যাদি। কলকাতা মফস্বলের অনেকগুলি বিজ্ঞানক্লাবই অনিয়মিতভাবে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। নানা বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ও অন্যান্য সম্মেলনের স্মরণিকা হিসেবেও ইদানীং বছরে দুচারটে বাংলা প্রকাশনা চোখে পড়ে।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, তা থেকে একটা কথা মোটামুটি বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে প্রাক্-স্বাধীনতা কালে বা উত্তর স্বাধীনতা কালে কোনসময়েই একসঙ্গে এতগুলি বিজ্ঞান সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে চালু বিজ্ঞান সাময়িকীগুলির গড় জীবনকালও আগের চেয়ে বেড়েছে এবং তাদের প্রচার সংখ্যাও ইদানীং বেশ বাড়ছে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান পত্রপত্রিকার এই জোয়ারের সময় এটা খুবই সম্ভব যে একই সঙ্গে ভালো এবং মন্দ দুইই বেড়ে চলেছে। পাঠককে তাই অনেকসময় মুস্কিলে পড়তে হয়। যা সহজপ্রাপ্য, যার বাণিজ্যিক প্রচার আছে, যা সুদৃশ্য রঙীন প্রচ্ছদে আকর্ষণীয়, তা তো সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ না-ও হতে পারে। এখন প্রশ্ন হ'ল ভালো-মন্দ বিচার করা যাবে কি ভাবে? অবশ্যই বিষয়বস্তু দিয়ে। কিন্তু সেখানেও গোলমাল। বিজ্ঞানের নামে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্যের মোড়কে অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান কোথায় লুকিয়ে থাকছে তা ধরা সহজ নয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তথাকথিত গ্রহের কোপ বা প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য নানারকম তাবিজ কবচ ধাতু পাথরের আংটি ইত্যাদি ধারণ করার কুপ্রথা আমাদের দেশে বেশ চালু। এখন কেউ যদি বলেন, এগুলোর মাধ্যমে আমাদের শরীর খুব অল্প পরিমাণে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কতকগুলি ধাতু-অধাতু সংগ্রহ করে, তবে এইসব কুপ্রথার সপক্ষে একটি "বিজ্ঞানভিত্তিক" আপাত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। চাই কি, কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে অল্প পরিমাণে অপরিহার্য, সেটুকু জেনে বিশেষ ধরনের সংকর ধাতুর তৈরী আংটি-তাবিজের ব্যবসায়েও নামা সম্ভব ! অথচ, সত্যি সত্যি আংটি ইত্যাদি থেকে কোনভাবে শরীরে কোন মৌলিক পদার্থ অনুপ্রবেশ করতে পারে কি না, করলে কি ভাবে কতটা করে, অন্যভাবে আমরা ঐসব মৌলিক পদার্থ কতটা পাই ইত্যাদি সম্পর্কে পরীক্ষালব্ধ তথ্যভিত্তিক আলোচনা এড়িয়ে গিয়ে—এ ধরনের কোন সিদ্ধান্তে আসা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক, অথচ অনেক সময়ই এমন ঘটে থাকে।

তাই বলছিলাম চালু বিজ্ঞান-পত্রপত্রিকাগুলির ভালো মন্দ বিচার সহজ নয়। তবুও, মোটের উপর, এটা বলা চলে যে কয়েকটি সাময়িকী সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক মূলনীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু কি সেই মূলনীতি, যার অভাবে বিজ্ঞানের নামেও অবিজ্ঞানের পসরা সাজানোর সম্ভাবনা থেকে যায়? খুবই কঠিন প্রশ্ন এবং তত্ত্বগত ভাবে ভূরি ভূরি আলোচনাতেও কোন সিদ্ধান্তে পেঁছনো শক্ত। তাই এক্ষেত্রে একটি বাস্তব পন্থা অনুসরণ করার চেষ্টা করা যাক, বর্তমানে চালু পত্রপত্রিকার কথা মনে রেখেই অবশ্য।

মোটামুটিভাবে তিন ধরনের লেখা বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়ে থাকে ঃ

(1) বিষয়ভিত্তিক—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ক লেখা। উদ্দেশ্য—এসব বিষয়কে মাতৃভাষায় সহজভাবে উপস্থাপন করা, বা আধুনিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো। অর্থাৎ, এক কথায়, জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর ও তার উপলব্ধিতে সহায়ক প্রবন্ধাদি।

(2) বিজ্ঞানকে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ও জীবিকার্জনের কাজে লাগিয়ে থাকি বা লাগাতে পারি এবং সেক্ষেত্রে কেমন ধরনের বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠতে হয় ইত্যাদি বিষয়ক লেখা। এবং

(3) বিজ্ঞান কিভাবে আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিগত ধ্যানধারণায় স্বচ্ছতা ও পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারে তৎসম্পর্কিত রচনা। বলা বাহুল্য এই বিভাগীকরণ নিতান্তই সাদামাটা এবং পরস্পরসম্বন্ধ।

বেশীর ভাগ বিজ্ঞান সাময়িকীই মূলত প্রথম কাজটি করে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পাঠ্য বই-এর পরিপূরক। আর সে ভূমিকা যদি সঠিকভাবে পালন করতে হয় তাহলে লেখাগুলিকে হ'তে হয় অনায়াস এবং মৌলিক। পরিচিত পরিবেশ থেকে উদাহরণ সাজিয়ে এমনভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা দরকার যাতে পাঠকের মনে হয় ইংরেজীতে বহুবার পড়ার পরও যেন বিষয়টি নতুন করে স্বচ্ছ হয়ে উঠল। দুঃখের কথা, এধরনের লেখা বাংলায় বেশ কম। প্রায়শই দেখা যায় বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বিষয়ে নীরস বর্ণনা, সামগ্রিক পরিকল্পনার দুর্ভিক্ষ এবং এমনকি, গুটিকয় ইংরেজী বই থেকে সারাংশ করে বাংলায় প্রায় তর্জমা করা। ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজীর চেয়েও যে এরকম লেখা দুর্বোধ্য হতে পারে, সে অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে (যারা ইংরেজী জানে না, শুধু তাদের জন্যই বাংলায় বিজ্ঞান পরিবেশন করা—এ মতে সায় দিতে আমি অক্ষম)। তবে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার—সব পত্রিকার এধরনের সব লেখাই, এই বিচারে, খারাপ নয়, তবে কোন কোন পত্রিকায় এধরনের ভালো লেখা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় বেশী।

অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের—কিশোর ও তরুণদের, বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য

এবং তাদের বিজ্ঞানে আকৃষ্ট করে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার জন্য যে আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত একথা সর্বগ্রাহ্য। এবং এক্ষেত্রে ভাষামাধ্যমের কোন বিকল্প নেই। বাংলায় এ ধররের লেখায় স্বভাবতই বিষয় থাকে প্রচ্ছন্ন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশ্রয় নেওয়া হয় 'বিজ্ঞানভিত্তিক' গল্পের বা কল্পবিজ্ঞানের। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের চেয়েও আবার কল্প-বিজ্ঞানেরই প্রাধান্য বেশী। পৃথিবীর সব দেশে সব ভাষায় এমন লেখা আছে, প্রয়োজনও স্বীকৃত, কাজেই বাংলাতেও থাকবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু যেটা আশ্চর্যের তা হ'ল—বাংলায় অতি নিকৃষ্ট ধরনের কল্পবিজ্ঞানের (বরং বোধহয় বলা উচিত "বিজ্ঞানকল্পে"র) অতিরিক্ত প্রাধান্য। কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে কল্পনার পাখা মেলে অল্পবয়সী পাঠকদের হাত ধরে লেখক অনায়াসে পেঁাছে দেন কখনও গভীর সমুদ্রের তলদেশে, কখনও মহাকাশে, মহাশূণ্যে, কখনও বা পরমাণুর অভ্যন্তরে, এমনকি রোমান্টিক এক জগতেও। মূর্ত হয়ে ওঠে অতীব শক্তিশালী রশ্মি, ভয়ংকর যুদ্ধাস্ত্র ; জেনেটিক প্রযুক্তি-বিদ্যা আকছার প্রয়োগ হয়ে হাঁসজারু বা বকচছপ বা ফ্রাংকেনস্টাইন তৈরী হওয়া কোন ব্যাপারই নয়! কোনটা যে প্রধান—গল্প না বিজ্ঞান, তা বোধহয় লেখকও ভুলে যান।

কিশোর পড়ুয়া এসব পড়ে—শুধু এসবই পড়ে—সত্যি সত্যিই বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হয় ? তবে তার কাছে 'বিজ্ঞানী' আর যাদুকর ম্যানড্রেক যদি একাকার হয়ে যায় তবে কার কি আসে যায় ? যদি বিজ্ঞান তার কাছে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-রোগভোগের উর্ধ্বে এক অসাধারণ বুদ্ধির ব্যায়াম বলে মনে হয়, যদি সে চারপাশের মানুষজন পরিবেশ প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে ওঠে, উদগ্র আগ্রহে পাড়ি দিতে চায় 'বিজ্ঞানে'র কোন এক স্বপ্নলোকে, যদি সে নতুন অভিনব এক মারণাস্ত্র উদ্ভাবনেরই স্বপ্ন দেখে, বসে তাতেই বা কি এসে যায় ? এসবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও—সবাই গবেষণা করতে চায় চটকদার কোন সর্বাধুনিক বিষয়ে। সাধারণের মনেও বিজ্ঞান আর ম্যাজিক মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। মনে হয়, এ ধরনের পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের প্রচার বা প্রসার নয়, এদের মূল উদ্দেশ্য ব্যবসা। আবার বলি, এ আমার ব্যক্তিগত মত, দ্বিমত থাকতেই পারে, তবে এ বিষয়ে আরও ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথম ধরনের লেখার তুলনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের লেখা বাংলা বিজ্ঞান পত্রপত্রিকায় নিতান্তই কম। অনেকে তো আবার শেষোক্ত দু'ধরনের বক্তব্যকে বিজ্ঞানের মধ্যেই গণ্য করতে চান না। একেবারে হাল আমলে অবশ্য এ ধরনের লেখাকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হ'চ্ছে না এবং দু-তিনটি পত্রিকাতো বিশেষভাবে এজাতীয় বক্তব্যকেই বাংলায় পরিবেশন করার চমৎকার সূচনা করেছে। আমাদের সামাজিক বাস্তবতাকে বিজ্ঞানের আলোয় বুঝতে, প্রগতির পথে ঐহিক-মানসিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক বাধাগুলিকে চিহ্নিত ও দূর করতে বিজ্ঞানের সহায়তা কিভাবে পাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনার দুঃসাহস তারা দেখাচ্ছে।

যে কোন ভালোমন্দ বিচারের মতই বাংলা বিজ্ঞান সাময়িকীর ভালোমন্দ বিচারেও নির্দিষ্ট চিরন্তন কোন নিরিখ নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু বিষয়টি বিজ্ঞান বলেই, এক্ষেত্রে তা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হওয়া সম্ভব। তাই বলি, যে সব বাংলা বিজ্ঞান পত্রপত্রিকা বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসারকেই মূল লক্ষ্য রেখে বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রাম করছে—তাদের খুঁজে নেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। খুঁজে নিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা অবশ্য একটা মানসিকতার ব্যাপার, এ মানসিকতা আমাদের আছে কিনা এখনই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। □

ELECDROLIK ENGINEERING COMPANY

Sri Aurobindo Road, Ramrajatala, Howrah-711104.

Phone ; 67-2017 Gtam, SPOOLVAL : Santragachi

MANUFACTURERS OF : PORTABLE OIL HYDRAULIC EQUIPMENT, viz :

Hydraulic, Floor Crane capacity 1-2 tonnes, Hand/Power operated Hydraulic Compressor jointing of ACRS conductor capacity 100 tonnnes, Power operated 2 stage High Pressure Pump Unit upto 600 Kg/cm^2, Lever operated spool type Directional Control Valve with in-built pilot operated Check Valve, Hand operated Hydraulic Clamp/Vice capacity up to 10 tonnes.

'কুসংস্কার নিয়ে বিতর্ক' : আরও মতামত

[**কুসংস্কার বিরোধিতার দিশা** প্রসঙ্গে বিতর্ক মঞ্চে মতামত এসে পড়েছিল অনেক। বিতর্কের সূত্রপাত মে-জুন 1984 সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি লেখা থেকে। অসীম চট্টোপাধ্যায় আর সৌমেন গুহ তাঁদের নিবন্ধ দুটিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন—আজকের দিনের কুসংস্কার বিরোধিতার আন্দোলন কতটা অর্থবহ, এই আন্দোলনের পিছনে যে মানসিকতা কাজ করছে তা কতটা সমর্থনযোগ্য। উল্লেখ করা দরকার, চট্টোপাধ্যায় ও গুহর লেখা দুটি কিন্তু স্বতন্ত্র দুটি মূল্যায়ন। অনেক বন্ধুই এ দুটিকে একই মতের প্রকাশ ধরে আলোচনা করেছেন। ফলে অনেক সময় একজনের বক্তব্য আরোপিত হয়েছে অন্যজনের উপর। যাই হোক, লেখা দুটিকে কেন্দ্র করে যে সব মতামত এসেছিল আমাদের কাছে, তার ভিতর থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল জুলাই-অক্টোবর 1984 সংখ্যায়।—বাকী চিঠিগুলিতেও দেখছি মোটামুটি একই বক্তব্যের প্রতিফলন। তাই এগুলিকে আর আলাদা করে সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করছি না আমরা—কেবল যে সব বক্তব্য স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবীদার বলে মনে হয়েছে সেগুলির সারাংশ উদ্ধৃত করছি এবারে। এই সংখ্যার সাথেই আপাতত যবনিকা টানছি 'কুসংস্কার বিরোধিতার দিশা' বিতর্ক মঞ্চের উপর।]

'কুসংস্কার বিরোধিতায় সৌমেন গুহর চিন্তা কতটা বৈজ্ঞানিক?' শিরোনামে দীর্ঘ নিবন্ধ পাঠিয়েছেন **সৃজন সেন**। কিছু অংশ—

"……সামাজিক মানুষ সমাজ বদলের বৈজ্ঞানিক দিককে অনুসরণ করেই তাদের ভাগ্য বদল করতে পারে। শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের অবসান ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে মানুষ যদি ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল থাকে, অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়, তবে আখেরে লাভ প্রভু শ্রেণীর—জনসাধারণের রোষের হাত থেকে তারা এর আশ্রয়ে বেঁচে যেতে পারে, তাদের প্রভুত্বের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। তাই কোনো সমাজ সচেতন মানুষই সামাজিক কুসংস্কারকে টিকিয়ে রাখার স্বপক্ষে কাজ করে না, কুসংস্কারের গুণগান করে না।"

"……ইংরেজরা তাদের শোষণ ও লুণ্ঠনের তাগিদে এদেশে যেটুকু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও শিক্ষাদিক্ষার প্রচলন করেছিল তা সমাজের উপরতলার সামান্য সংখ্যক লোককেই স্পর্শ করেছিল, পশ্চাদপদ চিন্তা-চেতনার অসীম অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যাপক ভারতীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি।……পুরানো সমাজ থেকে প্রাপ্ত কুসংস্কারসমূহ এখনো এদেশের মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ চালানোর ক্ষেত্রে নির্দ্ধারক ভূমিকায়।"

"……পুলিশের গুলিতে শত শত কৃষক মরলেও সেই কিষাণ ঘর থেকে আসা এ দেশের পুলিশ সেনাবাহিনীর লোকেরা বিদ্রোহ করে না। কিন্তু তাদের মন্দির 'অপবিত্র' হওয়ার কারণে বিদ্রোহী হতে ভয় পায় না। তাই দেখি, এদেশে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম, শ্রমিক সংগ্রাম, ছাত্রযুবদের সংগ্রাম ইত্যাদি বহুবার সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণকে নাড়া দেওয়ার আন্দোলন হয়েছে খুব কমই। সুতরাং 'কুসংস্কার' এদেশের জনজীবন নিয়ন্ত্রণে কিছুতেই "নগণ্য ভূমিকা পালন করে" না, আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে "কম ঝুঁকি, বাধা ন্যূনতম", একথা বলার কোন যুক্তি নেই।"

"আমাদের দেশের ব্যাপক রুগ্ন মানুষ যখন জড়িবুটি, হাতুড়ে ডাক্তার, ওঝা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল, তখন তাদের আধুনিক ঔষধপত্র ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার কাজই হোল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষী, অলৌকিক বিশ্বাস, যাদুমন্ত্র ইত্যাদির হাত থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ করা। আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাজনিত কুফল আর তার ব্যবহারকারীদের দ্বারা সৃষ্ট মুনাফাসৃষ্টিকারীদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই এখনো থাকবে, তবে সেটা এখনই মুখ্য স্থান অধিকার করতে পারে না। সৌমেনবাবুর মূল ভ্রান্তি এখানেই।"

'…সুতরাং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কারের বর্তমান সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমে মানুষকে উৎসাহিত করে তোলা ও মানুষকে বিজ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল করার কাজে আমাদের উদ্যমকে নিযুক্ত করাই হোক আমাদের কর্মসূচী, সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি নয়! কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানোর ক্ষেত্রে আমরা কোনো ক্ষেত্রেই আপোষ করবো না। কিন্তু সক্রিয় আন্দোলন করার সময় আমরা বাস্তব অবস্থা দ্বারা নির্দ্ধারিত সীমাকে অতিক্রম করে যাবো না—এটাই আন্দোলনের বিজ্ঞান।"

দুর্গাপুর থেকে **ভবানীপ্রসাদ সাহু**ও দীর্ঘ আলোচনা এবং মতামত পাঠিয়েছেন। তাঁর কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

"…দুঃখের বিষয় গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের সহযোগী অধিকাংশ সংগঠনগুলি, উৎস মানুষ বা এ ধরণের দু'চারটি বই-পত্রিকাগুলির প্রায় সব কটিই কম বেশী কুসংস্কারের সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকটির প্রতি যে গুরুত্ব দেয় তা লেখকের [সৌমেন গুহর—বি-ও-বি] জানা থাকার কথা হলেও এই ইতিবাচক দিকটিকে না তুলে বরং তাতে ঘুরিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হলো।"

"…একটি সংস্কার বা তথাকথিত কুসংস্কারের পেছনের সামাজিক—

অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে দিকগুলিকে মাথায় রাখার কথা বলা হয়েছে (পৃঃ 18) কিংবা লোকজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়তা ও সংপৃক্ততার যে কথা বলা হয়েছে (পৃঃ 16) তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অস্বীকারও করা হয় না। টুসু সহ লোকসংস্কৃতির নানা দিককে অস্বীকার করা, তার সমাজ-ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ও সংরক্ষণের বিরোধিতা—এগুলিও করা হয় না। তবু যা বলা বা করা হয় না, তার দায় আন্দোলনের কর্মীদের উপরে চাপালে কি করা যায় ?"

"...অবশ্যই, প্রয়োজন আরো বেশী, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা দরকারও আরো বেশী, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদের সৃষ্টি করা কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার দরকারও আরো বেশী পরিমাণে। এ করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে, মানুষ যার জন্য প্রস্তুত নয় তা যেমন জোর করে চাপানো ঠিক নয়, তেমনি ঠিক নয় নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকা বা শ্লথ হওয়া। এ প্রসঙ্গেও মাও সে-তুং-এর মন্তব্যকে স্মরণ করা যায়, "...সাধারণ মানুষেরা নানাবিধ কুসংস্কারে এখনো আচ্ছন্ন। এইগুলি হচ্ছে মানুষের মনের ভেতরের শত্রু। অনেক সময় দেখা যায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চেয়ে জনগণের মনের ভেতরকার শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আরো বেশী কঠিন। জনগণকে ডাক দিয়ে আমাদেরকেই বলতে হবে তাদের নিরক্ষরতার, কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্যকর বদভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য।..." (সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যুক্তফ্রন্ট ; অক্টোবর, 1944) আর এ সংগ্রামে সাফল্য যে রাজনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা নির্ধারিত হয় তা বলা বাহুল্য এবং আগেই বলা হয়েছে। এবং বি-ও-বির আলোচ্য লেখার কোথাও কোথাও এদিকে অংগুলি নির্দেশ থাকলেও আগেই আলোচনা করা নানা দিক থেকেই রয়েছে স্ববিরোধিতা, বিভ্রান্তি ও ক্ষতিকর চিন্তাগুলি। আশা করি আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় (এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও) এ ধরনের গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক, বস্তুবাদী দর্শন অনুসারী করার জন্য আরো বিতর্ক ও আলোচনা এবং প্রয়োগ চালানো হবে।"

"কুসংস্কারের" বিরুদ্ধে বিজ্ঞান আন্দোলন—এই শিরোনামে বক্তব্য পাঠিয়েছেন **দীপংকর দত্ত**। উদ্ধৃতি—"বিষয়টি পদ্ধতির—বিজ্ঞান আন্দোলনের গতিমুখ ঠিক করার নীতি সংক্রান্ত। সুতরাং বিষয়টি গভীর। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যে যদি কোথাও 'ভুল চিন্তা' থাকে তা দেখিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য ! ...উচিত ছিল 'ভুল' চিন্তা-গুলিকে উপস্থাপিত করে—সেগুলো কেন 'ভুল' মনে হচ্ছে দেখানো। এবং কি 'সঠিক' তা যুক্তি দিয়ে তুলে ধরা। এটা করতে লেখকদ্বয় হয় অপারগ—নয়ত এ কাজকে নিজেদের 'মর্যাদার' পরিপন্থী মনে করেন।"

"...এ ধরনের লেখা খুব ক্ষতিকারক। কারণ বিভ্রান্তিকর। মেঘ দূর করে না—ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী বিজ্ঞান আন্দোলনের বাহক হোক—দয়া করে বুদ্ধির টিয়ারগ্যাস ছুড়বেন না।"

পরের লেখক **মধুসূদন দত্ত**। লিখছেন—

"...সৌমেনবাবুর লেখাটা পড়ে 'কুসংস্কার' বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন না স্বপক্ষে বলছেন তা বোঝা গেল না। খুব সহানুভূতির সংগে বিচার করলে মনে হয় তিনি বলতে চান কিছু সংস্কারকে 'কুসংস্কার' বলা চলতে পারে (কোন ধরনের সংস্কারকে এমন বলা যাবে তাঁর লেখা থেকে সে বিষয়ে বিশেষ কোনো ইংগিত পাই না)। সেগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য শক্ত ভিত দরকার।"

"কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধে পত্রলেখকের মনোভাব খুব সংক্ষেপে এই—এই আন্দোলন একটা দৃষ্টিভংগী গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সাধারণ মানুষের নিজের পরিবেশকে ভালোভাবে জানার ও বোঝার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অবশ্যই ঠিক যে শুধুমাত্র এই আন্দোলনের সাহায্যে আজকের দিনের বড় বড় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয়। একথা বলাই বাহুল্য—বিজ্ঞান আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবর্ত হিসাবে কখনই কাজ করতে পারে না (উৎস মানুষ পত্রিকায় বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে এমন বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে) এবং এইসব আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করতে পারে। একথা বলা যায় শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন না থাকলে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন বেশী দূর এগোতে পারে না এবং শক্তিশালী বিজ্ঞান আন্দোলন জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকেই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এমনটা হতেই পারে যে বিজ্ঞান আন্দোলনের কোনো প্রবক্তার মধ্যে উচ্চমন্যতা আছে, সেক্ষেত্রে এই মনোভাবেরই বিচার ও সমালোচনা দরকার, কারো উচ্চমন্যতা কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের যৌক্তিকতাকে নস্যাৎ করতে পারে না।"

বৃক্ষ দেখা হয়েছে, অরণ্য দেখা হয় নি শিরোনামে **মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার**—

"...লৌকিক কুসংস্কারের তুলনায় 'বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের' শোষণ ও ক্ষতি করার ক্ষমতা বেশী, শ্রীগুহের এই বক্তব্যে সত্যের অনেকটাই আছে। কিন্তু তার জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী না করে তার অপপ্রয়োগকে দায়ী করাই কি সংগত নয় ?...শ্রীগুহ ঠুটোমারির বাঁধ নির্মাণে, ধর্মের ষাঁড়ে যা দেখতে চেয়েছেন, অসীম চট্টোপাধ্যায় তাকে 'ফোক সায়েন্স' নামই দিয়ে ফেলেছেন। একে 'ফোক কালচার', শ্রমজীবী জনসাধারণের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞা ইত্যাদি বলা বেশী সংগত মনে হয়।"

"সমাজতত্ত্ব ও মানুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদের কিছু ধারণা আছে, তাঁরা জানেন যে সংস্কার আর কুসংস্কার, সংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতির সীমারেখা বড়ই অস্পষ্ট। ...সংস্কৃতি (কু+সু) সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধারণ করবার জন্যেই সৃষ্টি। সুতরাং সংস্কার সর্বত্রই 'কু'

নাও হতে পারে, শ্রীগুহের এ কথাটা ঠিক। সমাজের শ্রমজীবী জনসাধরণের সংস্কৃতিতে পরশ্রমজীবী বিজ্ঞান-শিক্ষিত লোকেরা কুসংস্কার খুঁজতে বেরুলে সৌমেনবাবু যদি বিরক্ত হন তাতে আমি তাঁর দলে।

"কিন্তু সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে চেঁচামেচি, বিশ্লেষণ ইত্যাদি না করলে, সমাজ ও উৎপাদনের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই সাহায্য করা হয় না? ইতিহাসের প্রায় সকল সফল ও মহৎ বিপ্লবের প্রায় পূর্বশর্ত হিসাবেই কাজ করেছে নানারকম সাংস্কৃতিক আন্দোলন। কারণ মানুষের চেতনার ভিতরেই বিপ্লবের প্রথম সূত্রপাত। ···শ্রীগুহের পাতি কুসংস্কারের 'ডিফেন্স' স্থিতাবস্থা বজায় ও বিজ্ঞান বিরোধিতার কাজেই অপব্যবহৃত হতে পরে, তা শ্রীগুহ চান বা না চান।"

বালী থেকে **পূরবী ঘোষ** প্রশ্ন রেখেছেন চট্টোপাধ্যায় আর গুহ'র কিছু কিছু বক্তব্যের উপর। চিঠির শেষে তাঁর বক্তব্য "···অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার-এর অসারতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যদি ওয়াকিবহাল না হয় (দু-এক দিনেই হবে তা বলছি না), তাহলে ওই বিশ্বাসের গণ্ডীর বাইরের জগৎটা নিয়ে তারা কখনই মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না।"

প্রিয় বন্ধুদের জন্য শিরোনামে দীর্ঘ চিঠি দিয়েছেন **অনীশ চট্টোপাধ্যায়**। তাঁর মূল বক্তব্যকে আটটি প্রস্তাবনার আকারে রেখে পরিশেষে সেগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টিভঙ্গীগত আলোচনা রেখেছেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়। তাঁর কিছু বক্তব্য—

"···চিরন্তন প্রথায় (উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া) শিক্ষা প্রণালীর বিরোধিতা করা এবং সেইসঙ্গে কি করে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমুখিতা ছাত্রাবস্থা থেকেই গড়ে উঠতে পারে তার পদ্ধতি নিরূপণ করা—পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। 'গণস্বাস্থ্য' পত্রিকায় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি শিক্ষাদান পদ্ধতির যে মডেল দেওয়া হয় বিজ্ঞানক্ষেত্রেও কি তা সম্ভব নয়?"

"সৌমেনবাবু যে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে যাবার আগে বলে নেই, রাস্তায় মিছিলের মানুষেরা 'চলবে না! চলবে না!' বলে আগে যখন ঊর্ধ্বমুষ্ঠিতে হেটে যেতো, মনে একটা আবেগ আসতো। এখন মনে হয় চিৎকার করে ওদের বলি 'চলবে না যে, করে দেখাও।···'

"···তাই বলবো সৌমেনবাবু যা বলতে-চান তা ঠিক, তবে এ রাস্তায় না গিয়ে বরং অনেক বেশী কাজ দেবে তিনি যদি এক নম্বর এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে করার মত কিছু বিজ্ঞানী হিসেবে করতে পারেন। অন্তত ঃ বিজ্ঞানী হিসেবে সত্য উদ্ঘাটন করতে পারেন। ইতিহাসে তার উদাহরণ বিরল নয়।'

দমদম থেকে **উন্মনা বন্দ্যোপাধ্যায়** শানিত সমালোচনা রেখেছেন তাঁর চিঠিতে। সংশয় প্রকাশ করেছেন, মে-জুন 1984 সংখ্যায় 'শীতলা ও গণতন্ত্র' শীর্ষক লেখাটিতে 'একটি প্রতিষ্ঠিত দৈনিক কাগজ'-এ প্রকাশিত যে চিঠির উল্লেখ আছে, "হয় এটি সেই বিখ্যাত 'পত্রিকা' যাতে সত্যির বদলে মিথ্যে খবরই বেশী থাকে নয়ত 'পত্রিকায় প্রকাশের' ব্যাপারটি পুরোটাই ভুয়া। আপনাদেরই সাজানো।" সবশেষে তাঁর বক্তব্য—

"একটি নিবেদন—আপনাদের পত্রিকার কাছ থেকে আমাদের চাহিদা একটু ভিন্ন মাপের। গণআন্দোলনকে দিশেহারা করে দেবার জন্য "উৎস মানুষ বিরোধী বিশেষ সংখ্যা"টি প্রকাশ না করলেই সম্ভবতঃ ভাল হত। বিতর্ক ভালো কিন্তু অপবিজ্ঞান-অপসংস্কৃতিকে উঁচুতে তুলে ধরে অপব্যাখ্যার বন্যা বইয়ে দিয়ে যে বিতর্ক তা মোটেই সুস্থ চেতনার পরিচায়ক নয় যদিও এমন ঘটনা সেই "প্রতিষ্ঠিত দৈনিক" কাগজের প্রশংসা পেতে পারে।"

ধানবাদ থেকে চিঠি দিয়েছেন **সিদ্ধার্থ লাহিড়ী**। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ—

"···নতুন দৃষ্টিকোণ খোঁজার নামে জনতার অবৈজ্ঞানিক সংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার মুখাপেক্ষী হওয়া লেজুরবাদী মনোভাবেরই পরিচয়।"

"বি-ও-বির অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিই এ ধরনের বিকৃত সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী বলে আমার বিশ্বাস। তাই অনেক খুঁটি-নাটি জেনে একটি বা দুটি বস্তু সম্পর্কে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাই তাঁরা উচিৎ মনে করেন।···সমগ্র বিষয়ের অংশবিশেষ নিয়ে বিশদ আলোচনা চালানো যেতে পারে, কিন্তু তা সামগ্রিকতায় পেঁছনর জন্যই, সামগ্রিকতাকে অস্বীকার করে নয়। আপনারা কিন্তু ঠিক এর বিপরীত পন্থাই বেছে নিয়েছেন। কেন এই সংকীর্ণতা? কেন এমন কুসংস্কার-দুষ্ট কথাবার্তা?"

পরিশেষে ঃ অসীম চট্টোপাধ্যায় ও সৌমেন গুহ'র লেখা দুটির উপর যে সব আলোচনা এসেছিল, আমাদের ছোট পত্রিকার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা জায়গা দিয়ে সেগুলির মূল বক্তব্য আমরা পাঠকদের সামনে রাখলাম পরপর দুটি সংখ্যায়। আবার বলি, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পত্রিকার নিছক বিরোধিতা করা বা 'সাজানো' রেফারেন্স দেওয়া আমাদের নীতির বিরোধী। মূল নিবন্ধ দুটি এবং সেগুলির উপর বিভিন্ন বক্তব্য প্রকাশের পর আমরা মনে করছি এখনই বিতর্ককে আরো টেনে নিয়ে যাওয়া জরুরী নয়। মতামতগুলি প্রকাশিত হ'ল—আপাতত এগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করি আমরা সকলেই, আমাদের কাজকর্মের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাই। তারপর প্রয়োজন হলে আবার না হয় এক প্রস্থ আলোচনা সমালোচনা চালান যাবে। বি-ও-বি'র পাতা ত' খোলা রইলই।

সঃ মঃ, বি-ও-বি

ভূপাল : অপারেশন নরহত্যা

ভূপাল দুর্ঘটনার পর ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানায় সঞ্চিত অবশিষ্ট 'মিক'কে প্রশমিত করার কর্মসূচীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন ফেইথ'। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এই বিপদসংকুল কাজের সাফল্য সম্পর্কে শেষ বিচারে আস্থা রাখতে হবে ভগবানের উপর।

ভগবানের পরেই ভারতীয় প্রশাসন বেশী 'ফেইথ' রেখেছিল ইউনিয়ন কার্বাইডের ইঞ্জিনীয়ার ও অফিসারদের উপর। কারণ অবশিষ্ট মারণ-গ্যাসকে প্রশমিত করার মূল কাজটি করেছে এরাই। বাইরের দর্শক অবশ্য অন্য জিনিস দেখেছে—দেখেছে মুখ্যমন্ত্রীর সাংঘাতিক টেন্সনের ভঙ্গী, হৈ হৈ করে হেলিকপটার থেকে জল ছিটানো, মিলিটারির যুদ্ধকালীন কর্মব্যস্ততা।

বস্তুত কার্বাইডের কর্মীরাই ছিল অপারেশন ফেইথ-এর যোগ্যতম লোক, কারণ তারা গত কয়েক বছর ধরেই করে আসছে এ 'অপারেশন'—ফসজেন ($COCl_2$) আর মিথাইল অ্যামিন (CH_3-NH_2) থেকে 'মিক' (CH_3-NCO) বানানো আর সেই 'মিক' থেকে কীটনাশক ('সেভিন') বানানো।

কার্বাইডের লোকেরা অপারেশন শেষ করে চলে যাওয়ার সাথে সাথে অসাধারণ তৎপরতা সহকারে সি-বি-আই-এর তদন্তকারী দল কারখানায় ঢুকে সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে—যাতে কোনো সূত্র বা সাক্ষ্যপ্রমাণ না লোপ করতে পারে কেউ।

দুর্ঘটনার পর থেকে এক মাসের ভিতরও কোনো সরকারী বক্তব্যে দেশের মানুষকে জানানো হয় নি মারণ গ্যাসটি কি ছিল—'মিক' না ফসজেন, না অন্য কিছু। এটুকু শুধু জানা গেছে, বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী অনেকগুলি পরীক্ষাগারে বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন কার্বাইড কোম্পানীর ট্যাঙ্কে সঞ্চিত রাসায়নিকগুলির উপর। এটা খুবই সম্ভব যে এই সব গভীর অনুসন্ধানের ফলে মারণ গ্যাসের নামটা না জানা গেলেও রসায়নবিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের কৃতিত্বে।

প্রশাসনের হয়ে যারা কাজ করছেন না সেরকম কিছু বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী অবশ্য গোড়া থেকেই বলছেন যে মারণ গ্যাসটি আর যাই হোক, মিক নয়। কারণ মিকের স্ফুটনাঙ্ক ভূপালের ঐ দিনকার তাপ-মাত্রার চেয়ে অনেক বেশী, মিক একটি প্রকট দুর্গন্ধযুক্ত রাসায়নিক, (এরকম দুর্গন্ধের কোনো রিপোর্ট ভূপাল থেকে পাওয়া যায় নি) এবং যতদূর জানা আছে, মিক এমন মারাত্মক এবং ব্যাপক মারণ-ক্ষমতা বিশিষ্ট নয়। বিপরীতে ফসজেনের স্ফুটনাঙ্ক অনেক কম (8°C), এর গন্ধ প্রকট নয়, এবং এটি একটি পরীক্ষিত মারণগ্যাস (সহনীয় মাত্রা 50 পি. পি. এম. অর্থাৎ এক লিটার বাতাসে 0·0১ সি. সি.)। মিক থেকে বিপরীত বিক্রিয়ায় অপনা থেকেই ফসজেন তৈরী হয়ে গিয়েছিল এ অনুমান ভুল, কারণ এরকম কোনো বিক্রিয়া হয় না। মিক জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মিথাইল অ্যামিন দেয়।

এর আগে কার্বাইড কোম্পানীর ঐ একই কারখানায় গত কয়েক বছরে নানান রাসায়নিক দুর্ঘটনায় হতাহত হয়েছিল বেশ কয়েকজন কর্মী। ডিসেম্বর, 1981-তে ফসজেনের বিষক্রিয়ায় এক কর্মী মারা যাওয়ার পর মার্কিন ইউনিয়ন কার্বাইডের পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কারখানা থেকে একদল বিশেষজ্ঞ এসেছিল ভূপাল কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তদন্ত করতে। এদের রিপোর্ট ছিল, ভূপাল কারখানায় ফসজেন গ্যাস লিক হয়ে দুর্ঘটনার বিপদ অত্যন্ত বেশী। মিথাইল আইসোসায়ানেট লিক হওয়ার বিপদও একইরকম বেশী—একথাও বলেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। বিপদের সম্ভাব্য উৎস সংখ্যায় প্রচুর—ত্রুটিযুক্ত ভাল্‌ভ, গ্যাস চলাচলের লাইনে গলদ, চাপমান যন্ত্রে গলদ, ঠিকমত জল স্প্রে করার ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি।

দুর্ঘটনার পর সি. বি. আই. এই রিপোর্টটি অত্যন্ত গভীরভাবে খতিয়ে দেখছে।

ভূপালের কারখানাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পৃথিবীর বৃহত্তম 'মিক' কারখানা। এর উৎপাদন ক্ষমতা বছরে 5 হাজার টন কীটনাশক।

তবে কোনোদিনই এই কারখানার আসল উৎপাদনমাত্রা 5 হাজার টন পর্যন্ত পৌঁছয় নি—1981 সালে উৎপাদন ছিল 2,704 টন। লক্ষ্য করার মত ব্যাপার, তার পর কিন্তু এই কারখানায় মিক ভিত্তিক কীটনাশকের উৎপাদনমাত্রা বেশ কমে গেছে।

গ্যাস দুর্ঘটনায় যে সব মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁদের রোগলক্ষণ দেখে বিষক্রিয়ার প্রকৃতি সনাক্ত করা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের ভিতর নানান মত দেখা দিয়েছে। তাঁদের আলোচনা-বিতর্কের সূত্রে আমরা যেটুকু জানতে

পারছি তার কিছু কিছু বিষয় থেকে অনেক চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। যেমন, আক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগলক্ষণের সাথে সায়ানাইডের বিষক্রিয়ার খুব সাদৃশ্য আছে। একথা প্রথম বলেছিলেন হামিদিয়া হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাঃ হিরেশ চন্দ্র, তবে তখন তাঁর কথায় কান দেয় নি কেউ। পরে এক জার্মান বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডনডারারও একই কথা বলেন। আক্রান্তদের রক্তের নমুনায় 'পিক্রিক অ্যাসিড টেস্ট' করে সায়ানাইডের উপস্থিতি লক্ষিত হয়েছে। সায়ানাইডের প্রতিষেধক হিসেবে থায়েসালফেট চিকিৎসায় আশাব্যঞ্জ উন্নতি দেখা গেছে বহু রোগীর ক্ষেত্রেই।

গ্যাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ও তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর সম্ভাব্য দীর্ঘকালীন প্রভাব সম্পর্কে যতটুকু আলোচনা হয়েছে তাতে গভীর উদ্বেগের কারণ রয়েছে। 'মিক' খুব সম্ভবত লাইসিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে এটি শরীরের অন্যান্য প্রোটিন ও এনজাইমের সঙ্গেও ক্রিয়া করতে পারে। ফলত শরীরের বিভিন্ন কলায় কোষের ভিতরকার বিপাকীয় ক্রিয়া ব্যাহত হয়ে দীর্ঘকালীন ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বেশী। ডি-এন-এ ও প্রোটিন সংশ্লেষও বিপর্যস্ত হতে পারে। সন্তানসম্ভবা মহিলাদের যাঁদের সন্তান ধারণকাল দশ সপ্তাহের কম তাঁরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দেবেন।

হিরোসিমা-নাগাসাকিতে বোমা ফেলার পরবর্তী সময়ে যে বিকলাঙ্গ রোগগ্রস্ত শিশুরা জন্মেছিল তাদের নাম 'হিবাকুশা'। ভূপালের পরবর্তী প্রজন্মের নাম কি রাখা হবে?

পি-টি-আই পরিবেশিত এক সংবাদ থেকে জন্ম নেয় কার্বাইড সম্পর্কে অনেক গভীর প্রশ্ন। ভূপাল শহরেই অবস্থিত ইউনিয়ন কার্বাইডের একটি 'গবেষণা ও উন্নয়ন' ('আর অ্যান্ড ডি') কেন্দ্র। সাধারণত 'কাঁচঘর' বা গ্রীন হাউস নামেই অভিহিত করা হয় এটিকে (শোনা গেছে এই কেন্দ্রে একটি প্রমোদগৃহও আছে, এবং মধ্যপ্রদেশের অনেক হোমরা-চোমরা ব্যক্তি এই গৃহটিকে ধন্য করে থাকেন—তবে সে অন্য প্রসঙ্গ)। এই কেন্দ্রে আপাতনির্দোষ কিছু গবেষণার সাথে বায়োটেকনোলজির গবেষণাও চালাত কার্বাইড কোম্পানি এবং এই গবেষণার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণই কায়েম করে নি মধ্যপ্রদেশ তথা কেন্দ্রীয় সরকার। পৃথিবীর সমস্ত দেশে যখন বায়োটেকনোলজির গবেষণা নিয়ে তুমুল আলোড়ন ও বিতর্ক চলছে তখন ভারতীয় প্রশাসনের এই উদার প্রশ্রয় (যার ভিতর রয়েছে ইনকাম ট্যাক্স ছাড়) সত্যিই এক অনন্যসাধারণ ঘটনা।

ভূপালের গবেষণা কেন্দ্রে কার্বাইড কোম্পানী আসলে জীবরাসায়নিক যুদ্ধের গবেষণা চালাচ্ছিল, এরকম অভিযোগ উঠেছে কোনো কোনো মহল থেকে। কার্বাইড কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছে এ কথার। তবে কিছু তথ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়নি তারা, বরং স্বীকৃতিই জানিয়েছে বিভিন্ন বিবৃতিতে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকৃতি—'নতুন অণু' (নিউ মলিকিউল) সংশ্লেষের কাজ হচ্ছিল এই কেন্দ্রে। 'নতুন অণু' বলতে বোঝায় জৈব কোষের অংশ, বিশেষত ডি-এন-এ'র খণ্ড সংশ্লেষিত করা, অনেক সময় কৃত্রিম অণুজীব (মাইক্রো-অর্গানিজম) তৈরী করা। ঠিক এই ব্যাপারটি নিয়েই কিন্তু দেশে দেশে বিতর্ক সব চাইতে তীব্র। কি কি ধরনের নতুন অণু তৈরী করত কার্বাইড? স্বভাবতই, জানা যায় নি।

ইউনিয়ন কার্বাইড ভূপালের গবেষণাকেন্দ্রে যে 'গবেষণা' চালাচ্ছিল তার অনুমতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অভ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (DST)। তবে কিসের ভিত্তিতে DST এই অনুমতি দিয়েছিল তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি ডিপার্টমেন্টের উপরমহল থেকে। ডি.এস. টি'র সেক্রেটারী ডঃ যশ পালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ইউনিয়ন কার্বাইড কি গবেষণা করছিল, তা জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ ('অভ পাবলিক ইন্টারেস্ট') নয়।

ইউনিয়ন কার্বাইডের অপর স্বীকৃতি, এখানকার গবেষণালব্ধ ফল খোদ মার্কিন কার্বাইড কোম্পানিই কিনে নিচ্ছে বিদেশী মুদ্রায়। একেই বলে উলট পুরান। আমরা ত' জানি, আমেরিকা থেকেই প্রচুর দামে বিজ্ঞানপ্রযুক্তি কেনে ভারত সহ অনেক দেশ। অথচ সেই আমেরিকারই সর্ববৃহৎ কর্পোরেশনগুলির অন্যতম ইউনিয়ন কার্বাইড কিনা ব্যগ্র হয়ে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন কিনছে ছোট শহর ভূপালে অবস্থিত একটা গবেষণাকেন্দ্র থেকে! তাহলে কি ব্যাপারটা অন্যরকম? নিজের দেশে বায়োটেকনোলজির যে গবেষণা করায় নানান অসুবিধা, অন্য দেশে সরকারী প্রশাসনের মাথায় হাত বুলিয়ে বেনামে সেই গবেষণা করানো? আর একটি দিকও আছে এছাড়া। ট্রপিকাল আবহাওয়ায় যে সব ফসল হয়, সরাসরি সেগুলি নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। কার্বাইড কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে ভূপালে পরীক্ষাগারের বাইরে ফসলের ক্ষেতে তারা ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট করে থাকে। ক্ষেতে উৎপন্ন ফসল থেকে 'জার্মপ্লাজম' আমেরিকায় পাঠানো হয়, এ বক্তব্যও অস্বীকার করে নি কার্বাইড কোম্পানী। কি তাৎপর্য বহন করছে এ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা?

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তথাকথিত সবুজ বিপ্লব এবং কীটনাশক ও রাসায়নিক সারশিল্পের ভূমিকা নিয়ে অনেক তথ্যমূলক আলোচনা হয়ে গেছে। মূল সিদ্ধান্তগুলি এখন বেশ মজবুত। কৃত্রিমভাবে তৈরী

উচ্চ ফলনশীল বীজগুলি থেকে ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজন প্রচুর রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক। এগুলি পরিবেশকে বিষাক্ত করে, জমির উর্বরতা ধ্বংস করে, আর মানুষকে পঙ্গু করার সাথে সাথে আরো কৃত্রিম বীজ—আরো কীটনাশক এই ধরনের বিষচক্র সৃষ্টি করে। ঠিক এখানেই বায়োটেকনোলজির ভূমিকা। কৃত্রিম বীজগুলি যদি এমন ভাবে তৈরী করা যায় যাতে এগুলি বিশেষ কিছু অণুজীবের আক্রমণে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর এই সব অণুজীবও যদি কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত করে ছাড়া যায় পরিবেশে, তবে সোনায় সোহাগা। কীটনাশকের ফাঁসে চিরতরে বাঁধা পড়ে যাবে গরীব দেশের কৃষি।

আর—মানুষ নাশক হিসেবেও কীটনাশক ফ্যালনা নয়।

ভারতে বিদেশী সহযোগিতায় ও নির্দেশনায় কীটনাশক, আগাছানাশক এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরীর বহু প্রকল্প চালু রয়েছে এবং আরো বহু প্রকল্প গৃহীত হতে চলেছে। এরকমই একটি প্রকল্প নিয়েছে ভারতীয় কোম্পানী হিন্দুস্থান ইনসেকটিসাইড্স—আমেরিকার মনসান্টো করপোরেশনের সহযোগিতায় বিউটাক্লোর নামক আগাছানাশক তৈরীর। প্রকল্পটি শুরু হতে চলেছে শীঘ্রই। এই বিউটাক্লোর সম্ভবত মনসান্টো কর্পোরেশনেরই তৈরী আগাছানাশক আলাক্লোর-এর সমধর্মী। সম্প্রতি আমেরিকার পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা EPA (এনভিরনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সী) পরীক্ষা করে দেখেছে এই রাসায়নিকটি নাক, অন্ত্র, থাইরয়েড ও ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে। আমেরিকায় এই রাসায়নিকটি আকাশ থেকে স্প্রে করে ছড়ানো নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই—ভারতে ত নিষিদ্ধ হয় নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আমেরিকায় পশ্চিম ভার্জিনিয়ার যে আদালতে ভূপাল দুর্ঘটনার ভিত্তিতে ইউনিয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধে প্রায় 12 হাজার কোটি ডলার ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেই আদালতেই চলছে মনসান্টোর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলাও। মামলা করেছেন মনসান্টোরই 176 জন কর্মী। তাঁদের অভিযোগ—কারখানার বিষাক্ত রাসায়নিকে ক্যান্সার সহ একাধিক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে—প্রাণও হারিয়েছেন কেউ কেউ।

ভারতেই আর একটি কারখানায় ট্যাঙ্কে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে ফসজেনের মতই মারাত্মক আর একটি রাসায়নিক—বরোদায় হিন্দুস্থান পেট্রোকেমিকাল্স কারখানায় হাইড্রেজেন সায়ানাইড। সাধারণভাবে এখানকার কারখানাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সেই ব্যবস্থার উপর সরকারী তদারকী সম্পর্কে যতটা জানা আছে তাতে এইসব কারখানা থেকে ভূপালের মত নরমেধ যজ্ঞ আর অনুষ্ঠিত না হওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত সেই অর্জুন সিং-এরই পথ নিতে হয়—অপারেশন ফেইথ—ভগবানে আস্থা রাখা।

সন্ধানী

ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের কনভেনশন

1. পর্যাপ্ত জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ চাই।
2. বিপজ্জনক ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বাতিল কর।
3. 'নিষিদ্ধ' ওষুধ নিষিদ্ধ কর।
4. ওষুধের দাম কমাতে হবে।
5. ওধুষের জেনেরিক নাম চালু কর।
6. ওষুধ শিল্প ও বাণিজ্যের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চাই।

★ কনভেনশন হচ্ছে রবিবার 20 জানুয়ারী 1985 তারিখে (বেলা 10.30 থেকে সন্ধ্যা 6টা)। স্থান: যুব কেন্দ্র, কলকাতা (মৌলালী)।

With the Compliments of

Office: 22-9125
23-7810
Resi : 72-1002

EARN 13% to 15% INTFREST
ON FIXED DEPOSIT WITH REPUTED PUBLIC LIMITED COMPANIES

FINANCE CORPORATION

(Fixed Deposit Advisers & Investment Consultants.)
1/1, VANSITTART ROW,
CALCUTTA-700 001
(Opposite Telephone Bhadan)
We also Represent Unit Trust of India and Deal in
SHARES, STOCKS & DEBENTURES.

আর কোন ভুপাল নয়

পরিবেশ আন্দোলন—কিছু সাংগঠনিক প্রশ্নঃ দৃষ্টান্ত খড়দহ

ভুপালের স্মৃতি সকলের মনকে ভারাক্রান্ত করে আছে। আমাদের এখানেও এমন কলকারখানা আছে। ত্রিবেণীর কাছে কেশোরাম রেয়ন, খড়দহের জয়শ্রী ফার্টিলাইজার, রিষড়ার এ্যালকালি কেমিক্যাল্‌স, দুর্গাপুর কেমিক্যাল্‌স। অনেক ছোটখাট ভুপাল ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। সেখানকার মানুষজন আতঙ্কিত। বিপদের কথা এতদিন জানতেন না এমন না। তবে পরিণতি এমন ভয়ংকর হতে পারে জানতেন না। এবার জানলেন। সাধারণ অবস্থায় ক্ষতি যা হওয়ার, ধীরে হয়। কদাচিৎ কদাচিৎ বড় ধাক্কায় বার করে আনে সকলকে ঘরের বাইরে। নতুবা ধ্বংসলীলা চলে নিঃশব্দে ঘরে ঘরে।

এমনই একটি এলাকা খড়দহ। ভুপালের ঘটনার দিন কয়েক আগেই গিয়েছিলাম দেখতে। নিয়ে গিয়েছিলেন এখানকারই জনকয়েক তরুণ বন্ধু। জয়শ্রী ফার্টিলাইজার, টিটাগর থার্মালপাওয়ার, হিন্দুস্থান হেভি কেমিক্যাল্‌স-এর চারপাশের গোটা এলাকা গ্যাস, শব্দ, গন্ধ, ধুলো-ময়লায় একাকার। বিপর্যস্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন। এমন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চান এরা। বয়সে তরুণ। উৎসাহ আছে, জানেন না ঠিক কি করতে হবে।

স্থানীয় লোকজন, কারখানার কর্মী এমন অনেকের সাথে কথা হল। বললেন তাদের অসুখ-বিসুখ কষ্টের কথা। মাঝে মধ্যে অবস্থা চরমে ওঠে। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অনেকে। আক্রোশে কারখানার দেওয়াল টপকে ইটপাথর ছুঁড়তেও কসুর করে না অনেকে—কবুল করলেন সে কথাও। অবশ্য মীমাংসার আইনী পথ এড়িয়ে যাননি। সংঘবদ্ধ করেছেন। কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন। অবস্থার এতটুকু হেরফের হয়নি। বা হওয়ার উদ্যোগ দেখা যায়নি। এখন কি করবেন তারা? —তাদের প্রশ্ন।

তরুণ ও প্রবীণ সকলের একই প্রশ্ন। জানতে চেয়েছিলেন আমাদের কাছে। স্বভাবতই খুশি করতে পারিনি তাদের। কারণ উত্তর জানা নেই। তবে হাল ছাড়লে চলবে না। উত্তর খোঁজার একটি প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এবং এক্ষুনিই। অন্ততঃ ভুপালের শিক্ষা তাই। বিভিন্ন এলাকার ভুক্তভোগী লোকজনদের একত্র করে ভাবনা শুরু করতে হবে।

সেদিন সকাল থেকে বিকেল অবধি অনেকে মিলে খড়দহ-টিটাগড়ের কারখানা ঘুরেছি। বিকেলে একটি সভার উদ্যোগ নিয়েছিলেন খড়দহ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ। স্থানীয় মানুষদের প্রত্যাশামত দূষণের বিরুদ্ধে কাজকর্ম করার অঙ্গীকার নিয়ে শুরু করেছেন কাজ।

মিটিং বসেছিল স্থানীয় একটি স্কুলের ঘরে। মাইকের ব্যবস্থা ছিল। অনেকক্ষণ আগে থেকে সভার খবর মাইকে ঘোষণা চলছিল। আগের দিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে খবর দেওয়া হয়েছিল। অথচ নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা বাদেও জনসমাগম আশানুরূপ হয়নি। লোক না এলে কাজ শুরু হয় কি ভাবে? দেরী হল। অবশেষে যথেষ্ট দেরীতেই শুরু হল সভার কাজ। অল্প লোক নিয়েই। বাইরে কর্মীরা তখনও পোস্টার টাঙাতে ব্যস্ত। ভেতরে সভার কাজ চলছে। ক্রমে দু' একজন করে জনা পঞ্চাশ লোক হল। উপস্থিত সকলে আগ্রহ নিয়ে শুনলেন এবং কেউ কেউ আলোচনায় অংশ নিলেন।

বিবরণটা একটু দীর্ঘ হ'ল। সমালোচনার জন্য নয়। বলা যায় আক্ষেপে। এমন আন্তরিক উদ্যোগ অথচ আশপাশের মানুষের কি চরম উদাসীনতা। অথচ সমস্যা এনাদের সকলেরই। এনারাই দূরে সরে থাকছেন। এঁদের দোষী সাব্যস্ত করছি না। আসলে হাজারো টানা-পোড়নে হালছাড়া ভাব সকলের। কিছুটা একঘেঁয়েমির ফলও।

অথচ উদ্যোগ যারা নিচ্ছেন তাদের আন্তরিকতায় খামতি নেই এতটুকু। এতটুকু আয়োজন করতে, কত সময়, অর্থ, শ্রম দিতে হয়েছে। গোটাটাই বহন করতে হয়েছে নিজেদের। তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার চাইব সকলেই। না হলেই আক্ষেপ হয়।

এত ব্যর্থতার শেষেও এমন উদ্যোগ থেমে থাকছে না। এক জায়গায় স্তব্ধ হলে শুরু হচ্ছে অন্যত্র। তবে প্রতিবারেই শুরু হচ্ছে গোড়া থেকে। এমন অবস্থার পরিবর্তন দরকার। চাই আর একটু ভাবনা।—প্রশ্ন করা নিজেদেরকেই। তবে কি আমাদের কাজের ধরনেই গলদ? অথবা সংগঠিত হওয়ার কায়দায়? একটি সাধারণ লক্ষণ সব ক্ষেত্রেই। —সব উদ্যোগেই যে কয়জন উৎসাহ নিয়ে শুরু করেন কাজ, কাজের শেষে সে কজনই অবশিষ্ট থাকেন। বড় জোর এধার ওধার হয় দু একজনের। অথচ আমাদের লক্ষ্য ভাবনাগুলিকে যথাসম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া পাঁচজনের মধ্যে। সমন্বিত করা অনেকের উদ্যম। কার্যতঃ হয় না। কার্যক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন না কেউ। আসেন না ভুক্তভোগী জনেরাও। —কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা প্রয়োজন। যে কোন উদ্যোগকে কেন্দ্র করে এই আলোচনা শুরু হতে পারে। আমাদের যে কোন একটি মিটিং বা মিছিল নিয়েই শুরু হোক আলোচনা। মানুষের সংগঠিত হওয়ার চলতি কায়দায় একঘেয়েমি এসে থাকলে নতুনভাবে ভাবতে হবে পথ। 'বি-ও-বি' এই আলোচনার ফোরাম হতে পারে।

আজ খড়দহ টিটাগড়ের বন্ধুরা সংঘবদ্ধ হতে চাইছেন। বাঁশবেড়িয়া, চুচুড়া, কুন্তিঘাটে এমন উদ্যোগ শুরু হয়েছে অনেকদিন আগেই। পানিহাটি বেঙ্গল কেমিকাল এলাকার মানুষেরও অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। দুর্গাপুরের বন্ধুদের সাথে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। উদ্দেশ্য সকলের একই। সকলের কাছেই আবেদন, একটু নতুনভাবে ভাবুন। কাজ করছেন সকলেই। যে যার জায়গায়। তবে এক সময় আর কুন্তিঘাট, খড়দহ, দুর্গাপুর, রিষড়ার কাজ আলাদা থাকবে না। ক্ষেত্র তৈরী হবে একসাথে ভাবনা ও কাজের। একই ধরনের কাজ একসাথে চলবে। আশ্বস্ত থাকবেন সব এলাকার মানুষজনই—জানা-পরিচিতের মধ্যে কোন না কোন এলাকার বন্ধু একই দাবী নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন—প্রতিবাদ আন্দোলন করছেন। কুন্তিঘাট, দুর্গাপুর, খড়দহ, পানিহাটি, টিটাগড় সব এলাকার বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের গন্ধ একই। তাই প্রতিবাদ একটাই এবং একই শত্রুর বিরুদ্ধে। র. চ

ভূপাল নিয়ে মিছিল-সভা

কাঁচরাপাড়া

গত 7ই ডিসেম্বর কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে একটি শোক ও ধিক্কার মিছিল কাঁচরাপাড়ার শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলের শেষে গান্ধী মোড়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভূপালের ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় এই সভায়। যেমন, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সরকারের ভূমিকা, বহুজাতিক কোম্পানীগুলির অনুসৃত জন-বিরোধি নীতি, সরকারী শিল্প নীতি ইত্যাদি। সকলেই এজন্য দায়ী কর্তৃপক্ষের নিন্দা করেন এবং জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন হতে অনুরোধ করেন।

খড়দহ

গত 16 ই ডিসেম্বর খড়দহ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে খড়দহে একটি মিছিল হয়। এতে সামিল হয়েছেন স্থানীয় অনেক পরিবারের মানুষজন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং মহিলারাও। ভোটের আগে বহু মিছিলের ফাঁকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এই মিছিল। ভূপাল নিয়ে বহু মানবিক দাবী ও স্থানীয় কলকারখানার দৌরাত্ম্যে বিপর্যস্ত মানুষদের আশা-আকাঙ্খা সম্বলিত স্লোগানে মুখরিত ছিল মিছিল। মিছিলের পথে ছিল যেমন ঘিঞ্জি বসতিপূর্ণ এলাকা, পল্লী অঞ্চল তেমনি জয়শ্রী কেমিক্যালস, টিটাগড় থার্মাল, হিন্দুস্থান হেভি কেমিক্যালস্ ইত্যাদি কারখানা এলাকা।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া

গত 22 শে ডিসেম্বর এঁদের অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ভূপাল নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল—এক, কীটনাশক নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলির কাণ্ডকারখানা—বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে। আর, ভূপালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দেহে কীটনাশক বিষের প্রভাব, জৈব ও রাসায়নিক যুদ্ধের সম্ভাব্য গবেষণা ইত্যাদি। আলোচনাসভার শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিদের জনাকয়েককে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

আগরপাড়া

গত 29 শে ডিসেম্বর পানিহাটি গণসংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয় বিবেকানন্দ স্কুলে "আর কোন ভূপাল নয়"—এই শিরোনামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যদিও সেদিন ভোটের ফলাফল নিয়ে মগ্ন ছিলেন মানুষ—তথাপি সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। ভূপালকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত প্রশ্ন মানুষের মনে উঁকি দিচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষভাবে আলোচনা হয় কীটনাশক ওষুধ উৎপাদন ও ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। সবশেষে স্থানীয় কারখানা পানিহাটি বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে উদ্ভূত নানা গ্যাসের সমস্যা ও তা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় গণ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়।

বাগনান

গত 30 শে ডিসেম্বর '84 একটি অভিনব মিছিল বাগনানের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মিছিলের স্লোগান ছিল "পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে শুধু আইন নয়, প্রয়োগ চাই", "সারা ভারতবর্ষকে ভূপালে পরিণত হতে দেব না," "ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে"। মিছিল চলার পথে কয়েকটি স্থানে পথসভায় বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য রাখেন। এটি বাগনান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা, কোটনিশ স্মৃতিরক্ষা কমিটি এবং ব্লু-স্টার সায়েন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

বিজ্ঞান আন্দোলনের দুই দরদী সহযাত্রী

বাদল

পনেরই আগস্ট 1981-তে পিপ্‌লস সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গণস্বাস্থ্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান শিবির বসেছিল বেলেঘাটার চাউলপট্টি বস্তি অঞ্চলে। স্থানীয় আগামী সংস্কৃতি মঞ্চের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাই সমস্ত কাজকর্ম ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছিল। তাদের কাজ, গান, নাটক অবাক করেছিল আমাদের। আগামী সাংস্কৃতিকে নতুন ধরনের একটা সংগঠন বলে মনে হয়েছিল। শুনলাম সংগঠনটি শুরু করার পিছনে তাদের বাদলদা'র (বাদল দে) উৎসাহ অনেকটা কাজ করেছিল। তখনই দেখেছিলাম বাদল শারীরিকভাবে অসুস্থ। কোনো গ্ল্যামার, কোনো স্বীকৃতির তোয়াক্কা রাখে নি, অসুস্থ শরীর নিয়ে অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ে শান্ত মানুষটা বস্তিতে গ্রামে চালিয়ে গেছে সাংস্কৃতিক কাজ। সবচেয়ে উপেক্ষিত মানুষদের সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টায় নিজেকে সামিল করেছে। শেষ পর্যন্ত দুরারোগ্য ব্যাধির স্বীকার হল। মারা গেল গত 25 অক্টোবর 1984 তারিখে। আমাদের জন্য রেখে গেল আত্মসমীক্ষার দায়।

বিশ্বপ্রিয়বাবু

জনবিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে এ রাজ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন চিন্তা-ভাবনা কাজকর্মের চেষ্টা করছে 1978-79 থেকে। খড়্গপুর আই. আই-টির কিছু ছাত্র শিক্ষক উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঐ সময়েরও আগে থেকে। নানাভাবে ওঁরা পথ দেখিয়েছেন, সাহায্য করেছেন সদ্যোজাত বিজ্ঞান আন্দোলনকে। বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন ওঁদেরই একজন। পেশায় আই. আই. টি'র ভাষা শিক্ষক। বহু ভাষা জানতেন। পাশাপাশি গবেষণা করতেন বিজ্ঞানের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব নিয়ে। লেখা দিতেন আশপাশের ছোট পত্রিকাগুলিতেও। উপস্থিত থাকতেন বিজ্ঞান আন্দোলনের মিটিং-এ মিছিলে। নিরহংকারী সরল মানুষ। অসাধারণ গান গাইতেন, বাঁশী বাজাতেন। মারা গেলেন মস্তিষ্কের ক্যান্সারে গত 21 সেপ্টেম্বর 1984 তারিখে। কিছদিন থেকেই ভুগছিলেন। মাঝে একটু ভাল হয়ে উঠেছিলেন। ভেবেছিলাম, আরো কিছু দিন আমাদের মাঝে পাবো ওঁকে। কিন্তু নীরবে চলে গেলেন বিজ্ঞান আন্দোলনের এই দরদী বন্ধুটি।

সঃ মঃ, বি-ও-বি

ভারতে বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান প্রয়োগে বাধা

ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা অনেক হচ্ছে। অনেকে প্রশংসা করছেন আমাদের অগ্রগতিতে। এত এত বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ্, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, মাটিতে-আকাশে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখে তেমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সত্যিই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন। তবে সকলে এতে সন্তুষ্ট নন। তাদের মাপকাঠি স্বতন্ত্র। দেশের অর্ধেক মানুষ পেট ভরে খেতে পায়না যেখানে, সেখানে বিজ্ঞান চর্চার এই দাবী নিছক মিথ্যা বাগাড়ম্বর।

এই ব্যর্থতার গোটা দায় বিজ্ঞানচর্চার—একথা মানতে রাজী নন অনেকে। আবার অনেকে বিশ্বাস করেন আধুনিক রাষ্ট্রে মানুষের জীবন-যাত্রার মান বাড়ানোর উদ্যোগে প্রধান ইনপুট নতুন নতুন জ্ঞান ও প্রয়োগ-পদ্ধতি। তাদের ধারণা অল্প সময়ে অনেক বেশী মানুষের জীবনে বাঁচার ন্যূনতম উপকরণ পেঁছিনোর একমাত্র উপায় হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুসংহত প্রয়োগ। আমাদের দেশে সেই কাজটিই এখনও হয়নি।

কিন্তু কেন? হচ্ছেনা কেন? বাধাটা কি বা কোথায়? এই প্রশ্ন অনেকের। অতীতে অনেকে করেছেন। এখনও করছেন। সম্প্রতি এই উদ্যোগ নিচ্ছেন আসাম সায়েন্স সোসাইটি। তাদের ডিব্রুগড় জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই বিষয়ে জাতীয় স্তরে একটি সেমিনার আয়োজন করেছিলেন গত 4 ও 7 সেপ্টেম্বর তারিখে। ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী মিলে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সত্তর জন প্রতিনিধি এসেছিলেন।

সভায় আলোচিত বিষয়গুলি এঁরা মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। এক, ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ধারার মধ্যে নিহিত সমাজ ও সংস্কৃতিগত বাধা। দুই, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক বাধা। তিন, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষ ধরনের বাধা। চার, চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চায় বাধা। পাঁচ, প্রতিবিধানের উপায়।

সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করে একইভাবে ভাবেন এমন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের ভাবনা একত্র করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে এই সেমিনারে। এই উদ্দেশ্যে একটি সর্বভারতীয় কনভেনশনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। উৎসাহী ব্যক্তি বা সংগঠন নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

P. Mahanta, (Secretary, Reception Committee for National Seminar on the Constraints in the Pursuit of Science in India), Physics Department, Dibrugarh University, Dibrugarh—786004, Assam.

বই-পত্রপত্রিকা পরিচিতি

মাসিক গণস্বাস্থ্য

বর্ষ 3, সংখ্যা 11-12 অগ্রহায়ণ 1391

দীর্ঘ চারমাস প্রতীক্ষার পর অবশেষে 'মাসিক গণস্বাস্থ্য আবার হাতে পেলাম। কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রকাশ হতে এত দেরী হলো তা এই সংখ্যার "গণস্বাস্থ্যে হামলা ঃ এ চক্রান্ত কাদের ?" পড়ার পরে ভালো-ভাবে বোঝা যাবে। উপলব্ধি করা যাবে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলি কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে! এইসব দেশের মানুষেরা যেখানেই কোনো সংগঠন গড়ে সাধারণ মানুষের সুস্থ জীবনের আশায় গঠনমূলক কোনো কিছু করতে চলেছে সেখানেই বিশ্বজোড়া নতুন আধিপত্যকারী বহুজাতিক কোম্পানীগুলি তাদের মুনাফার গতিকে অপ্রতিহত রাখার জন্য ঐ গঠনমূলক প্রচেষ্টাকে আক্রমণ করছে —এমনকি তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও কাজে লাগিয়ে— অবিশ্বাস্য সত্য এটাই। 1981 এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কিছু ডাক্তার দেশপ্রেম আর সুস্থ সমাজ গড়ার অদম্য স্পৃহা সম্বল করে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করার জন্য সীমান্তে গড়ে তোলে হাসপাতাল। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর 1972 এর এপ্রিলে সাভারের অদূরে গড়ে তোলে স্থায়ী ক্লিনিক। ক্রমশঃ জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে। সেদিনের জোতদার থেকে শুরু করে আজকের সরকারী আমলা আর বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানীগুলির ষড়যন্ত্রকে বারবার ছিন্নভিন্ন করে আজ পরিণত হয়েছে একটি পাবলিক ট্রাস্টে। আজকের গণস্বাস্থ্যের আছে সস্তায় জনসাধারণের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধ যোগান দেওয়ার জন্য গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিটিকেলস, নিজস্ব কর্মীদের শিক্ষিত করার জন্য পাঠাগার, বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বৈকালিক বিদ্যালয়, আর আগ্রহীদের সচেতন হওয়ার জন্য 'মাসিক গণস্বাস্থ্য'পত্রিকা—নতুন মূল্য বোধগড়ে তোলার এক বলিষ্ঠ হাতিয়ার। অথচ ঘটনা এটাই, এই সব গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তথাকথিত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব সাধারণ শ্রমিকদেরই লেলিয়ে দিতে চাইছে!

সদ্য স্বাধীন দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের এই ধরণের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে এই সংখ্যায় আমরা পাবো আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন কি ভূমিকা পালন করছে তার একটা স্পষ্ট ছবি ডঃ পরেশ চট্টোপাধ্যায়ের "বিকশিত সমাজতন্ত্রের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন" রচনায়। 'গতিশীল সমাজতন্ত্রের নির্ভীক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই প্রবন্ধটি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। শুধু তাই নয়, তথাকথিত সমাজতন্ত্রে তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের বৈপরীত্য, চাওরার সঙ্গে পাওয়ার ভয়াবহ ফারাকের সম্পর্কে সচেতন করে পুরানো ধারণাগুলিকে আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করায় এই লেখাটি।

ডঃ সুখময় ভট্টাচার্যের কলমে ফুটে ওঠে আপাত মহামারীর অন্তরালে জীবাণু পরীক্ষামূলক গবেষণার ভয়াল চক্রান্ত।

স্বাস্থ্যকর্মী এবং সচেতন মানুষেরা পাচ্ছেন—'স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্যে ডেভিড ওয়ার্নার ও বিল বাওয়ার-এর Helping Health Workers Learn গ্রন্থের অনুবাদের অংশ বিশেষ, "ওষুধের ব্যবহার বিধি" (জি উপ্সনডা, জন যুডাকিন এবং জি. ভি. ব্রাউন-এর Guidelines to drug usage) গ্রন্থের অনুবাদের অংশবিশেষ, "বিশ্বস্বাস্থ্য" শিরোনামে চিকিৎসা, প্রতিষেধক, বিপদ ও সাবধানতা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি, শিশুদের জীবন ও ঔষধ শিরোনামে শিশুচিকিৎসার পরামর্শ।

মেয়েরা এর পরেও পাচ্ছেন একঝাঁক বৈচিত্রময় রচনা "প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা", "বিকলাঙ্গ মহিলাদের সমস্যা," "অধিকার বনাম সম অধিকার", "—যা ভাবনা চিন্তা এবং করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলায় সহায়ক অবশ্যই।

ধূমপানকারীরা অধূমপায়ী হওয়ার জন্য অবশ্যই পড়বেন "ধূমপান ছাড়বেন কেমন করে"। এছাড়াও পাবেন পাঠকের মতামত 'চিঠিপত্র' গুচ্ছ এবং 'মানুষ তৈরী কি সম্ভব' সম্পর্কে ধারণা।

সম্পূর্ণ পড়ার পর অবশ্যই একবাক্যে স্বীকার করতেই হয়—গণ-স্বাস্থ্যের এই সংখ্যাটি নিজে পড়ার পরে অন্যদেরকেও পড়ানোর দাবী রাখে।

[ঠিকানা ঃ মাসিক গণস্বাস্থ্য,
পোঃ ধামরাই, ভায়া নয়ারহাট, ঢাকা, বাংলাদেশ।
কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান ঃ কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের দোকান কথাশিল্প, বুকমার্ক, বাউলমন। দাম ঃ বাংলাদেশের পাঁচ টাকা] **প্রদীপ দত্ত**

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বি-ও-বি'র দাম বাড়লো। এক টাকা থেকে হ'ল দু' টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার নতুন হার বার টাকা। পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা চাই।

সম্পাদকমণ্ডলী

এনভায়রনস্

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইফ সায়েন্স বিভাগ থেকে প্রকাশিত তথ্য-পুস্তক। খুব সম্প্রতি প্রকাশিত। ইংরাজী ভাষায় লেখা। পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করতে এই উদ্যোগ। পরিবেশ বিষয়ে পড়াশুনো, ভাবনা এবং কাজ করতে চান এমন সব ব্যক্তি এবং সংস্থার দরকারী খোঁজখবর একত্রিত করা হয়েছে এই বইতে।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা এবং উৎসাহী বিজ্ঞান ক্লাব যারা পরিবেশ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা কাজকর্ম করেন তাদের নাম-ঠিকানা আছে এতে। কলকাতায় অবস্থিত বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পরিবেশ বিষয়ক যে সমস্ত বই আছে তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আছে আনুসঙ্গিক জার্নালের নাম। ফিল্ম ও ভিডিও ক্যাসেটের হদিস দেওয়া আছে। এছাড়া আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাক্রমের পরিচয়।

বইটি উপকারী সন্দেহ নেই। তবে অসম্পূর্ণ মনে হয়। যেমন পরিবেশ বিষয়ে যারা কাজকর্ম ভাবনা করেন শুধু তাদের নামের তালিকা দেওয়া যথেষ্ট নয়। কি ধরণের কাজ তারা করেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে ভাল হত। —যেমন আছে ফিল্মগুলি সম্পর্কে দুএক লাইনে পরিচিতি।

বইয়ের তালিকা অসম্পূর্ণ এবং খানিকটা অযত্নে তৈরী। হয় লেখকের নামের অক্ষর অনুযায়ী সাজানো উচিত ছিল অথবা বিষয় ভাগ করে সাজানো উচিত ছিল। তার পাশে পাশে কোন লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে তার সংক্ষিপ্ত নাম দিলেই হত। এতে উৎসাহী পাঠকের দরকারী বইটি খুঁজে নেওয়া সুবিধের হত এবং একই বইয়ের তিন-চার বার করে উল্লেখ এড়ানো যেতো। কলকাতার লাইব্রেরীগুলিতেই মিলবে এবং পরিবেশ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণে সাহায্য করবে এমন কয়েকটি বই তালিকায় পেলাম না।

সব মিলিয়ে বইটি বেশ কাজের। উৎসাহী লোকজন বইটি সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বইটি বিনামূল্যে প্রচারের জন্য রচিত। তবে কোথা থেকে পাওয়া যাবে উল্লেখ নেই। সম্ভাব্য ঠিকানা—Life Science Centre, Calcutta University, 35 Ballygunj Circular Road, Calcutta-700019. র. না. চ.

রিপোর্ট

জ্যাকারীর সম্মেলন

জাকারীর পঞ্চমবার্ষীক সাধারন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত 13 ই নভেম্বর 1984 তারিখে বোস ইনস্টিট্যুট হলে। এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীসুকোমল সেন। এই সভায় বিভিন্ন অটোনমাস প্রতিষ্ঠানে যে অগণতান্ত্রিক ধারা চলছে তার সমন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এই ব্যাপারে জ্যাকারীর বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 14 তারিখের প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েও আলোচনা হয়।

আলোচনা ঃ হতাশা ও তার প্রতিরোধ

মৃদঙ্গ সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে 2 ডিসেম্বর' 84 শিবপুরের বি. কে. পাল ইনস্টিটিউশন স্কুলে "হতাশা ও তার প্রতিরোধ" শীর্ষক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। পপ্লভলভ ইনস্টিটিউটের ডাঃ ইন্দ্রজিত সেনগুপ্ত তাঁর আলোচনায় বলেন অতৃপ্তির লক্ষণ সক্রিয়তা এবং হতাশার লক্ষণ নিষ্ক্রিয়তা। বর্তমান সমাজের তীব্র অসম প্রতিযোগিতা থেকেই মূলতঃ হতাশা ও নিয়তিবাদের জন্ম। একে প্রতিরোধ করতে হলে ব্যক্তিগত নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে এই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কর্মধারাকে পরিচালিত করতে হবে। জীবনকে একটা গতিশীল প্রক্রিয়া হিসাবে দেখতে হবে এবং ব্যর্থতায় দিশাহারা না হয়ে তার কারণকে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আলোচনার শেষে ডাঃ সেনগুপ্ত আগ্রহী শ্রোতাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন।

নাগরিক কনভেনশন ঃ ইঞ্জিনীয়ার আন্দোলন

14ই ডিসেম্বর। মুসলিম ইনস্টিটিউট হল। বিভিন্ন প্রফেশনাল ও গণসংগঠনের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নাগরিকরা একত্রিত হয়েছিলেন ইঞ্জিনীয়ার আন্দোলনের সমর্থনে। তিন দফা দাবী নিয়ে রাজ্যসরকারী ইঞ্জিনীয়ারদের সংগঠন (FAETO) গত পয়লা থেকে সতেরই ডিসেম্বর অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এদের প্রচারিত প্রচারপত্রে বলা হয়েছেন—"উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত বিভাগে প্রযুক্তিবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিষ্ঠা, জনস্বার্থে প্রযুক্তিবিদদের সৃজনশীল ভূমিকার যথাযথ ব্যবহার, ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো ও বেতননীতির পরিবর্তন এবং পাশা-পাশি জনস্বার্থের অনুকূল প্রকল্পগুলি রূপায়ণে আমলাতান্ত্রিক বাধা অপসারণের লক্ষ্য"—এই তিন দফা দাবী নিয়ে তাদের আন্দোলন।

ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানকর্মী, ট্রেড ইউনিয়নকর্মী —এমন অনেকে একে একে মঞ্চে উঠে এই আন্দোলনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সকলেই সহানুভূতি ও সমর্থন জানান আন্দোলনের প্রতি। যত দ্রুত এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয় তার জন্য উদ্যোগ নিতে বিশেষভাবে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানালেন সকলেই। আন্দোলন সংগঠকদেরও এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে অনুরোধ জানান অনেকে।

ইঞ্জিনীয়ার সংগঠকদের তরফে সভায় উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক ব্যবহার মনে রাখার মত।

স্বাধীনতা

এক আশীর্ব্বাদ এবং সুযোগ

৩৭ বছর আগে দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমরা স্বাধীন জাতি সমূহের পরিবারে যোগ দিয়েছিলাম।

তারপর থেকেই জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমর দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছি।

- আজ আমাদের কৃষকেরা জাতির চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করছে।
- শিল্পোৎপাদনে বিশ্বের জাতি সমূহের মধ্যে আমরা এক গৌরবময় স্থানের অধিকারী।

সকলের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করবার জন্য নতুন ২০ দফা কর্মসূচী আমাদের অবিরাম প্রচেষ্টার একটি মুখ্য হাতিয়ার।

এই লক্ষ অর্জনের জন্য কাজ করতে পারলে তবেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা এবং সংহতিকে সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশক্তির বিপদ থেকে রক্ষা করে তাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারবো।

আমাদের স্বাধীনতার ৩৮-তম বৎসরে আসুন আমরা কঠোর পরিশ্রম এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার শপথ গ্রহণ করি—যা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছে দিতে পারবে।

কেউ যেন আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে

R. N. 34929/79

VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o D. S. Enterprise,
52/9C B. B. Ganguli Street, Calcutta-12

YEAR 8 NUMBER 3

NOV.-DEC. 1984

প্রকাশিত হলো

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও ইনফেল্ডের পদার্থবিদ্যার বিবর্তন (40 টাঃ)

অনুঃ ডাঃ শক্রজিৎ দাশগুপ্ত, এম. বি, ডি. পি. এম, এম. আর. সি. সাইক (ইংল্যাণ্ড)

বিজ্ঞান যাঁদের পেশা নয় অথচ পদার্থবিদ্যার মূলচিন্তাধারা যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের জন্য এর চাইতে ভাল বই খুঁজে পাওয়া দুস্কর। পেশাদার বৈজ্ঞানিক আবদ্ধ থাকেন তাঁর নিজস্ব বিষয়ের ছোট্ট কোণে। এ বই তাদের সুযোগ দেবে এক পাশে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের পূর্ণ অবয়বের দিকে দৃষ্টিপাত করার। জে. এ. ক্রোথার

সতুবস্তির উপাখ্যান (3য় সংস্করণ) (15 টাঃ) পঞ্চাশের মন্বন্তরে ক্ষুধা, যুদ্ধ ও মহামারীর বিরুদ্ধে আর মনুষ্যত্বের স্বপক্ষে মানুষের লড়াই নিয়ে এই অবিস্মরণীয় গল্প-সংকলনটি আজও প্রাসঙ্গিক।

উৎমানুষের প্রশ্ন উত্তরের সংকলন ঃ

প্রশ্ন উত্তরে বাছবিচার (10 টাঃ)

জ্বর হলে কেন ভাত খাবে না, স্নান করবে না? টক খেলে গানের গলা নষ্ট হয়? মাথা ধরে কেন? হাঁসের ডিম না মুরগীর ডিম খাওয়া ভাল?—এ ধরনের বহু প্রশ্ন উত্তরের প্রথম সংকলন।

তরুণ সংবাদিক নাজেস আফরোজের

আন্ত্রিক 84 : মানুষের তৈরী মহামারী (7 টাকা) যথেষ্ট তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন নাজেস।

বাংলদেশের গণস্বাস্থ্য সংকলন(প্রথম পর্ব) টনিক, ভিটামিন, বহু শিশুখাদ্য এবং বেশীর ভাগ ওষুধই মানুষের প্রয়োজনে নয়, বহুজাতিক কোম্পানীগুলির জনগণের পকেট কাটার দুরভিসন্ধি মাত্র, এ বিষয়ে নানা তথ্য ও যুক্তিতে ভরা 'গণস্বাস্থ্য' পত্রিকার বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নানা নিবন্ধের প্রথম সংকলন।

সতুবস্তির রোজনামচা [4র্থ সং] (14 টাঃ)

রোগ ও রোগীর সামাজিক পরিবেশ নিয়ে গল্প সংকলন।

মা নিষাদ—ডাঃ শক্রজিৎ দাশগুপ্ত (15 টাঃ)

শ্রেণীযুদ্ধের দৃষ্টিকোণে রচিত রামায়ণ ভিত্তিক নাটক।

বাতুল দ্বাদশিকা—ডাঃ শক্রজিৎ দাশগুপ্ত (20 টাঃ)

মন ও মনরোগীদের নিয়ে গল্প সংকলন।

রাঙা মাটির কড়চা—ডাঃ শক্রজিৎ দাশগুপ্ত (15 টাঃ)

ক্ষুধার গল্প সংকলন। দীর্ঘ ভূমিকায় ক্ষুধার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাউলমন প্রকাশন

(মানবমন কেন্দ্র বাউলমন প্রাঃ লিঃ অংশ)

28, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলিকাতা-700019

ফোন : 46-2770, 42-7042

With best compliments from

RAJIB CONCERN

26, RAMESHWAR SAHA ROAD

CALCUTTA-700 014

SUPPLIERS OF

ALL TYPES OF LABORATORY CHEMICALS FOR UNIVERSITIES,
COLLEGES AND R. & D. CENTRES.
HIGH RELIABILITY AND PROMPT SERVICE.

রবীন মজুমদার কর্তৃক মুদ্রাকর প্রেসের পক্ষে গীতা প্রিন্টার্স, 21 পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9 হইতে মুদ্রিত।